উৎসর্গ

শ্রীত্রিপুরেশ্বর মিত্র
শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র

নিবেদন

কোন কিছু আলোচনা ভারী গভ্যবন্ধে পরিণত না ক'রে সাধারণ মজলিসি ভাবে করবারই আমি পক্ষপাতী। "দেশ" পত্রিকায় গানের আসরে সে সুযোগ পুরোপুরি মিলেছে। তারপর "চতুরঙ্গ" পত্রিকাতেও খোলাখুলিভাবে কিছু লিখেছি। এইসব লেখাগুলি একত্র করে প্রকাশিত করা গেল।

লেখাগুলি ছাপা হবার পর দেখছি কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। যে বিষয় আমার প্রিয় নানা প্রসঙ্গেই তার উল্লেখ এসে গেছে এবং সুসম্পাদিত করবার অভিপ্রায়ে তাকে আর কেঁটে ছেঁটে বাদ দিই নি। ঘরোয়া কথাবর্তায় এমনটা ঘটে থাকে। এটা তারই উদাহরণ।

আজকে যাঁরা বাংলার সংগীতে নতুন পথের সন্ধান করছেন তাঁদের পূর্ববর্তী স্রষ্টারা কোন্ পথে চলেছেন সেটা জানবার আগ্রহ থাকা তাঁদের স্বাভাবিক। হয় তো এইসব ছোট ছোট লেখায় সেই সব প্রচেষ্টার বিবরণী তাঁদের কৌতূহল কিয়ৎ পরিমাণে পরিতৃপ্ত করতে পারবে।

বিনীত—

৩রা আশ্বিন, ১৩৬৩ শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ

বাংলার অধ্যাত্মসঙ্গীতেরও একটি মানবতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। রামপ্রসাদের গানে এর পরিচয় মেলে প্রচুর। কুলকুণ্ডলিনী আর ষট্‌চক্র ছাড়াও রামপ্রসাদের গানে তাঁর সমসাময়িক জীবনধারার সুখদুঃখের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালী খুব একটা ঘরোয়া-ভাব খুঁজে পেয়েছে রামপ্রসাদের গানে—কি বস্তুসম্পদে কি সুরের দিক থেকে। তাই রামপ্রসাদ বাঙালীর এত প্রিয়।

রামপ্রসাদের গানকে অনেকে লোকসঙ্গীতের পর্য্যায়ে ফেলেন তার কারণ প্রসাদী গানে কিছুটা বাউল ঢংএর পরিচয় আছে কিন্তু সাঙ্গীতিক দিক থেকে বিচার করে দেখলে এই ধরনের গানকে লোক-সঙ্গীত বলা যায় কিনা সন্দেহ কেননা রাগসঙ্গীতের প্রভাবও এসব গানে নেহাৎ কম নয়। রামপ্রসাদের গানে প্রধান সুর হচ্ছে ঝিঁঝিট এবং লুম। ঝিঁঝিট-খাম্বাজের রূপ বহু বিচিত্রভাবে বার বারই রামপ্রসাদী গানে ফুটে উঠেছে। এর ফলে ইচ্ছা করলে বেশ সুন্দর ভাবে রাগসঙ্গীতের ধরনে খেলিয়ে রামপ্রসাদী গান গাওয়া যায়। বস্তুত রামপ্রসাদী গানের এরকম একটা traditionও চলে আসছে। রামপ্রসাদ নিজে রাগসঙ্গীত ভালই জানতেন; সুতরাং তিনিও যে খুব সাদামাটাভাবে তাঁর গান গাইতেন এমন মনে হয় না। পরবর্তী-কালে টপ্পার যুগে অনেক রামপ্রসাদী গান তো রীতিমতো ওস্তাদি ঢঙেই গাওয়া হ'ত। রামপ্রসাদ যে সব গানই এক ছকে ফেলে রচনা করেছেন এমন নয়। "কালী হলি মা রাসবিহারী" এই গানটি ভৈরবীতে রাগসঙ্গীতের রীতিতে সুর দেওয়া হয়েছে। "এমন দিন কি হবে তারা"—এই গানটিও সিন্ধুতে রচিত।

রামপ্রসাদী গানের প্রধান তাল হ'ল লোফা। এটি খোলের তাল

এবং এই তালেই রামপ্রসাদী গান মজে ভাল। এছাড়া একতালা, আড়-খেমটা আছে—ষৎ তালেও কিছু কিছু গান রচিত হয়েছে। রামপ্রসাদের গীত সংগ্রহে যেসব ক্ষেত্রে একতালা বলে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি বেশির ভাগই হয় লোফা নয় আড়-খেমটা। আড়-খেমটার চাল একতালার চেয়ে চটুল এবং এর একটি নৃত্যভঙ্গি আছে। রামপ্রসাদী গানের প্রতিটি কলির শেষ চরণে এই ছন্দবিন্যাস এত চমৎকার যে যখন একটি কলির পর প্রথম লাইনটি আবার ফিরে আসে তখন মন যেন ঐ লোফা আর আড়-খেমটার নৃত্যদোদুল ছন্দে আপনা থেকে নেচে ওঠে।

রামপ্রসাদ কিন্তু শুধু একটি রীতি অবলম্বন করেই ক্ষান্ত হন নি। তাঁর প্রতিভার আরও পরিচয় রেখেছেন "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যে এবং "কালীকীর্তন" রচনায়। এই কালীকীর্তনের গানগুলিও ভিন্ন ঢংএ গাওয়া হ'ত বলে মনে হয় যেমন তাঁর আগমনী সঙ্গীতের রীতি ঠিক প্রসাদী ঢঙের ছিল না। এই সব গানে তিনি প্রাচীন প্রচলিত রীতিই গ্রহণ করেছেন। প্রসাদী রীতিও অবশ্য প্রচলিত রীতিরই একটি রকমফের তথাপি এতে রামপ্রসাদের বিশেষত্ব আছে অনেকখানি। সব মিলিয়ে এর চমৎকারিত্ব এইখানে যে, অন্তরাগুলিতে প্রায় ক্ষেত্রেই বাউলসুলভ বৈশিষ্ট্য থাকলেও রাগসঙ্গীতের স্পর্শ থাকাতে একটা সহজ সরল অথচ গভীর ভাব ফুটে উঠেছে। ইচ্ছে করলে লোক-সঙ্গীতের ভাবটি বেশি বজায় রেখে এ গান গাওয়া যায় আবার ইচ্ছানুসারে একে রাগসঙ্গীতের ঢঙে রূপান্তরিতও করা যায়।

তবে এই রীতির প্রসার খুব বেশি নয়। এই এক ধরনের ভক্তি-রসাত্মক গান ছাড়া রামপ্রসাদী ঢংকে আর কোথাও আরোপ করা চলে না। এদিক দিয়ে রামপ্রসাদী রীতির বিকাশ অতিশয় সীমাবদ্ধ। এই রীতিকে যাঁরা অনুরূপ রচনায় প্রয়োগ করেছেন তাঁরা সার্থক হয়েছেন। যথা কমলাকান্ত। তাঁর বহুপদ রামপ্রসাদী ঢঙে সার্থক রূপায়িত হয়েছে।

আনুমানিক ১৭২৩ সালে রামপ্রসাদ সেন কুমারহট্ট হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেন। সময়টা খুব ভাল ছিল না। রামপ্রসাদের কৈশোর এবং যৌবনে দেশে ঘোরতর অরাজকতা চলেছিল। ওরই মধ্যে বাঙ্গালীকে কোনরকমে গা বাঁচিয়ে চলতে হয়েছে। তথাপি দেশে টোল-মক্তবের অভাব ছিল না—লোকের লেখাপড়া শেখবার স্থযোগ ছিল। রামপ্রসাদ সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন এবং পারসী-উর্দু ও বেশ রপ্ত করেছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর কলকাতায় এসে এক জমিদারভবনে মুহুরী নিযুক্ত হন। এই সময়টা তিনি মাতৃসাধনায় বিভোর হয়ে থাকতেন এবং শোনা যায় দপ্তরের খাতায় স্বরচিত সঙ্গীত লিখে রাখতেন। একদিন খাতায় লেখা "আমায় দাও মা তবিলদারি" গানটি নাকি তাঁর মনিবের নজরে পড়ে এবং তিনি রামপ্রসাদের অবস্থা বুঝে তাঁকে চাকরি থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন।

রামপ্রসাদ আবার হালিশহরে ফিরে এলেন এবং এইবার পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করে কালীসাধনায় নিমগ্ন হলেন। তিনি নাকি শবসাধক ছিলেন। প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে গিয়ে তিনি বহুক্ষণ গান করতেন এবং গঙ্গার ঘাটে যাঁরা থাকতেন তাঁরা তাঁর এই সঙ্গীত উপভোগ করতেন। এইভাবে গায়ক হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়। তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং সন্তানাদি সহ গৃহস্থজীবন যাপন করেছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের একটি কাছারি বাড়ি ছিল কুমারহট্ট গ্রামে। একবার এখানে এসে তিনি রামপ্রসাদের গান শুনলেন। তাঁকে বৃত্তি দিয়ে নিজের সভায় নিয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু রামপ্রসাদ রাজি হলেন না। কেবলমাত্র একশ' বিঘা নিষ্কর জমি দান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন রামপ্রসাদ। তাঁর "কবিরঞ্জন" উপাধিও নাকি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত।

শোনা যায় একবার নবাব সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় যাবার পথে হালিশহরের ঘাটে রামপ্রসাদের গান

শুনেছিলেন। রামপ্রসাদ তাঁকে শুধু শ্যামাসঙ্গীত নয়—ধ্রুপদ, কাওয়ালি, গজলও শুনিয়েছিলেন। এই কাহিনী এত অধিক প্রচলিত যে এর মধ্যে কিছু সত্যতা আছে--বলেই মনে হয়।

পলাশীর যুদ্ধ গেল। দেশের ভাগ্য পরিবর্তন হ'ল। কিছু কাল কাটবার পর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরও দেশের ওপর দিয়ে চলে গেল। এরই কয়েক বছর পরে রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শোনা যায়। তিনি নাকি কালীমূর্ত্তি বিসর্জনের সঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কারুর মতে বিসর্জনকালে গান গাইতে গাইতেই তাঁর মৃত্যু হয়। যাই হোক তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু অলৌকিক ঘটনার প্রচার হয়েছে। শ্যামাসঙ্গীত, কালীকীর্তন, বিদ্যাসুন্দর ছাড়াও রামপ্রসাদ কৃষ্ণ এবং শিব বিষয়ক বহু পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর বহু রচনা এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

রামপ্রসাদের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আজু গোঁসাই ছিলেন খুব চিত্তাকর্ষক প্রকৃতির লোক। তিনি ছিলেন ভারি কৌতুকপ্রিয়। রামপ্রসাদ শাক্ত আর তিনি বৈষ্ণব। সুতরাং পরিহাসের ভিতর দিয়ে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বটি গোঁসাই বজায় রেখেছিলেন। রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

এ সংসার ধোঁকার টাটি
ও ভাই আনন্দ বাজার লুটি।

আজু গোঁসাই গাইলেন—

এ সংসার রসের কুটি
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি।

বাংলার সঙ্গীতেও এইভাবে কেউ রচনা করেছেন আধ্যাত্মিক প্রভাবে আবার কেউ গান গেয়েছেন রসোপভোগের প্রেরণায়। কিন্তু সে প্রেরণা যেমনই হোক না কেন জীবনের সুখ দুঃখানুভূতির মাধ্যমেই তার প্রকাশ ঘটেছে।

বাংলার আদি গীতকার রামনিধি গুপ্ত

নিধুবাবুর টপ্পা ভদ্রসমাজে গাইতে মানা—এমনই ছিল কিছুকাল পূর্বের সংস্কার। তারও পূর্বে লোকে কিন্তু নিধুর টপ্পার নামে মেতে উঠত। কী তার ভাষা, কী তার বাঁধুনি, আর কী তার সুর। তানে তানে কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে পৌঁছুতো। পৌঁছবে না কেন? এমন করে দু-চার কথায় প্রাণের কথা কি কেউ আগে বলেছে? এমন করে সুরে সুরে কি কেউ প্রেমের আগুন জ্বালিয়েছে? আর সেই আগুনে হৃদয়ের সব কাঠিন্য গলিয়ে করুণ রসের নির্ঝর ঝরিয়ে দিয়েছে।

দেড়শো বছরেরও কিছু আগেকার কলকাতা। শোভাবাজারের এক প্রসিদ্ধ আটচালায় সন্ধ্যার আসরে এক প্রিয়দর্শন বর্ষীয়ান ভরাট গলায় গান ধরেছেন সিন্ধু কাফিতে। করুণ প্রেমের গান—টপ্পার আন্দোলনের সঙ্গে হৃদয়াবেগ উঠছে উচ্ছলিত হয়ে। পিছনে দাঁড়িয়ে যে ভৃত্য হাওয়া করছে, সেও থেকে থেকে আনমনা হয়ে পড়ছে, পাখা আসছে ঝিমিয়ে। ফরাসের ওপর গালচে, তার ওপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে শহরের গণ্যমান্য বাবুদেরও সেই অবস্থা। মাথা দুলে দুলে উঠছে, গুড়গুড়ির নলটা হাতে ধরা, কিন্তু তামাকের চেয়ে আরও বড় নেশায় তখন মন মশগুল। মৃদুকণ্ঠে আওয়াজ হচ্ছে—"বাহা বাহা বহুৎ আচ্ছা"। দু-চার লাইনের ছোট্ট গান, কিন্তু তার ভাব তার ব্যাপকতা অনেকখানি। নানা কাজে, নানা তানে, নানা বিস্তারে যখন সে গান শেষ হল, তখন শ্রোতাদের আর সাধুবাদ দেবার ভাষা নেই—শুধু চোখে জল টলমল করছে। এমনি ক্ষমতা ছিল নিধুবাবুর আর এমনি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁর গানে ছিল কাঁটা আর সেই কাঁটার জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে এক সময় সন্ধান পাওয়া যেত ফুলের—সকল কাঁটা ধন্য করা হৃদয়রক্তে রঞ্জিত টকটকে লাল সেই ফুল।

১৭৪১ সাল অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধেরও ষোল বছর আগেকার বাংলা। সময়টা যে খুব ভাল ছিল তা নয়। একটা রাষ্ট্রের পতন হচ্ছে আর একটা রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান ঘটছে। ওদিকে বর্গীর হাঙ্গামা আসছে থেকে থেকে। জমিদারেরা স্বেচ্ছাচারী—সুশাসন সুশৃঙ্খলা নেই। তবু ওরই মধ্যে মোটামুটি লোকে মন্দ ছিল না—আমোদ-আহ্লাদও ছিল, তবে কিছুটা স্থূল, আদিরসের প্রাবল্যে অভিষিক্ত। রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর জন্ম হল এই সময়ে। বাংলা সাহিত্যে তখন ভারতচন্দ্রের রাজত্ব। অন্নদামঙ্গল যখন লেখা হয়, তখন নিধুবাবুর বয়স এগার এবং ভারতচন্দ্র যখন মারা যান তখন তিনি উনিশ বৎসরের তরুণ। ভারতচন্দ্রের রচনা পড়তে পড়তে তিনি হয়তো প্রেরণা পেতেন নতুন কিছু সৃষ্টি করবার, কিন্তু অল্প বয়স থেকে তিনি গান লিখতেন কি না, তার পরিচয় আমরা পাই না। যে ক'টা গান আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা সবই তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। তিনি বেঁচেছিলেন অনেক দিন—মাত্র তিন বৎসরের জন্য শতায়ু হতে পারেন নি।

নিধুবাবুরা ছিলেন কলকাতায় কুমারটুলির বাসিন্দা—তবে তাঁর জন্ম হয়েছিল ত্রিবেণীর কাছে চাঁপতা গ্রামে। বর্গীর ভয়ে তাঁর বাবা পালিয়ে এসেছিলেন এইখানে। অল্প বয়সেই রামনিধি পড়াশুনা করেছিলেন মন্দ নয়—ছ' বছর বয়সেই গ্রামে যেটুকু শেখা যায়, তা শিখেছিলেন। তারপর বাবার সঙ্গে এলেন কলকাতায়। এখানে এসে শিখলেন সংস্কৃত, পারসী। এক পাদ্রী সাহেবের কাছে ইংরেজীও শিখেছিলেন, তবে কতখানি, তা জানা যায় না। যাই হোক নিধুবাবু রীতিমতো শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি যে নতুন আদর্শে গান লিখেছিলেন, তার মূলে ছিল এই শিক্ষা এবং সংস্কৃতি। তাঁর যুগে খুব অল্প ইংরেজি জানেন, এমন লোকও প্রায় ছিল না বললেই হয়, সুতরাং প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি একজন, একথা আজ ঐতিহাসিকদের কাছে চাপাই পড়ে গেছে।

কলকাতায় তাঁর চাকরি জুটল না। কলকাতায় তখন শান্তিও নেই, শৃঙ্খলাও নেই। রাজনৈতিক বিরোধ, যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর একটার পর একটা এলো গেল। তাঁর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ তখন একদিন দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লেন ছাপরার দিকে। ছাপরা কালেক্টারির দেওয়ান ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী, তাঁর চেষ্টাতেই পেয়ে গেলেন কেরানীর চাকরি। চাকরিটা ভালই পেয়েছিলেন। নির্বিবাদে আঠারো বছর করে গেলেন সরকারী চাকরি। ইতিমধ্যে মনিব পাল্টে ছিল, তাঁর সঙ্গে মতের অমিল হল। শেষ পর্যন্ত দিলেন চাকরি ছেড়ে। তারপরে যেমন একদিন ছাপরার পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তেমনি আবার দুর্গা বলে ফিরে চললেন কলকাতার দিকে। তখন তাঁর বয়স হয়েছে। ফিরলেন বটে, তবে খালি হাতে নয়। শোনা যায় তাঁর সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি এককালে বহু টাকা পেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গীতের সংগ্রহ এনেছিলেন অনেক। সেই সঙ্গীতের রসে বাংলা দেশকে তিনি একাই মাতিয়ে রেখেছিলেন, যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তো বটেই, তারপরেও বহুদিন পর্যন্ত। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের ওপরেও নিধুবাবুর প্রভাব ছিল বড় কম নয়।

নিধুবাবু ভাল রকম গান-বাজনা শিখেছিলেন বোধ হয় ছাপরা যাবার আগেই। ছাপরায় গিয়ে তাঁর পরিচয় হল টপ্পার সঙ্গে। সেটা টপ্পার উঠতি যুগ। বাংলায় তখন বৈঠকি আসরে বোধ হয় চলেছে ব্রজবুলি পদে রচিত ধ্রুপদ। টপ্পার মধ্যে নিধুবাবু এক নতুন আলোর সন্ধান পেলেন। ছাপরায় বহু বৎসর তিনি টপ্পা শিখেছিলেন এবং সংগ্রহও করেছিলেন। সাকরেদি করতেন এক মুসলমান ওস্তাদের—এঁরই কাছে ছিল টপ্পার আড়ত। কয়েক বৎসর পর ওস্তাদজী দেখলেন সাকরেদ পাকা গাইয়ে, অনেক কিছু শিখে নিয়েছে--এমনি চলতে থাকলে ওস্তাদজীর পুঁজিপাঁটা খতম্ হতে বেশিদিন লাগবে না। অতএব ওস্তাদজী রাশ টানলেন, তেমন তালিম আর দিতে চান না। ঠেকিয়ে ঠুকিয়ে চলে গেল আরও

কিছু দিন। অবশেষে চাকরির মেয়াদ ফুরোতে ধুত্তোর বলে তিনিও দিলেন ওস্তাদকে ছেড়ে, যা নিয়েছেন তাই যথেষ্ট। অবশেষে এক শুভদিনে বাংলার শোরিমিঞা বাংলায় ফিরে এলেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল যাঁরা তাঁকে গান দেয় নি, তাদের পুঁজি তিনি বিলিয়ে দেবেন, পশ্চিমী টপ্পাকে রূপায়িত করবেন বাংলা গানে, বাংলা দেশে বইয়ে দেবেন টপ্পার বন্যা।

বাংলায় ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পারিবারিক জীবনে দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। এই সময় তাঁর প্রথম পুত্রের মৃত্যু হয় এবং তার কিছুদিন পরেই তাঁর প্রথম স্ত্রীও পরলোক গমন করেন। শোকে অধীর হয়ে তিনি এই গানটি রচনা করেন ঃ—

কেদারা জলদ—তেতালা

মনপুর হতে আমার হারায়েছে মন
কাহারে কহিব কার দোষ দিব নিলে কোন জন,
না বলে কেমনে রব বলে বল কি করিব
তোমা বিনে আর সেখানে কাহার গমনাগমন।
অন্যের অগমনীয়, জান সে স্থান নিশ্চয়
ইথে অনুমান, হয় এই প্রাণ তুমি সে কারণ,
যদি তাহে থাকে ফল, লয়েছ করেছ ভাল
নাহি চাহি আমি, যদি প্রাণ তুমি করহ যতন॥

ইতিমধ্যে আর একবার বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু সে স্ত্রীও বেশিদিন বাঁচেন নি। এই বৃদ্ধ বয়সেই আবার সংসার পাতলেন তিনি। চারটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে হল, তার মধ্যে তিনটি সন্তানের মৃত্যু শোকও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল অতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। অবশেষে ১৮৩৮ সালে সাতানব্বই বছর বয়সে মৃত্যু এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল।

অতি দীর্ঘ জীবনে নিধুবাবু বাংলার যে সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তন দেখেছেন, তেমন সুযোগ খুব কম লোকেরই হয়। তাঁর

জন্মের সময় আলিবর্দি যুদ্ধের ভিতর দিয়ে বাংলার মসনদ দখল করেছেন। তারই সঙ্গে সঙ্গে এলো পর পর নিষ্ঠুর বর্গীর আক্রমণ। কলকাতায় ইংরেজের সঙ্গে নবাবী সৈন্যের সঙ্ঘর্ষ বোধ হয় তিনি চোখের ওপর দেখেছিলেন—তখন তাঁর বয়স পনেরো বছর। তারপরেই এলো পলাশীর যুদ্ধ, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল পরিবর্তনের ফলে দেশে দুর্ভাগ্যের সীমা রইল না। চারদিকে অনাচার, অত্যাচার, দারিদ্র্য, বিভীষিকা, নৈতিক অধঃপতন। এরই মাঝখানে নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়ে চলল মধ্যবিত্তের জীবন। তারপরে এল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—সে দৃশ্যও নিধুবাবু স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তারও কয়েক বছর পরে তিনি কলকাতা ছেড়েছিলেন। ছেড়ে ভালই করেছিলেন, নইলে সেই দুর্ভোগের মধ্যে থেকে তিনি কিছু দিয়ে যেতে পারতেন কিনা সন্দেহ। যেমন এদিককার হতাশাময় দৃশ্য তাঁকে দেখতে হয়েছিল, দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনাও অতি পরিণত বয়সে তিনি কিছুটা দেখে যেতে পেরেছিলেন। রামমোহন রায় তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হলেও তাঁর প্রচেষ্টা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দু-একটি ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁর রচনার মধ্যে আছে।

ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ৺উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ একদিন নিধুবাবুকে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করতে অনুরোধ করেন। অনুরোধ শুনে কিছুকাল মৌন থেকে নিধুবাবু রচনা করলেন—

বেহাগ—আড়া

পরম ব্রহ্ম তৎপরাৎপর পরমেশ্বর
নিরঞ্জন নিরাময় নির্বিশেষ সদাশ্রয়
আপনা আপনি হেতু বিভু বিশ্বধর
সমুদয় পঞ্চকোষ জ্ঞানাজ্ঞান যথাবাস
প্রপঞ্চ ভূতাধিকার
অন্নময় প্রাণময় মানস বিজ্ঞানময়
শেষেতে আনন্দময় প্রাপ্ত সিদ্ধ নর ॥

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় নিধুবাবুর এই ক্ষমতায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। যিনি সারাজীবন প্রীতিগীতি রচনা করে কাটিয়েছেন তিনি যে এমন আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচনা করতে পারেন এবং এত গভীর দার্শনিকজ্ঞান তাঁর থাকতে পারে এটা কল্পনা করা শক্ত। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এই গানটি রামমোহন রায়ের সম্মতিক্রমে ব্রাহ্মসমাজে গাওয়াবার জন্য উৎসুক ছিলেন কিন্তু রামমোহনের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলার নবযুগের প্রতিষ্ঠা যখন হয়েছে, তখন তিনি আশী পেরিয়েছেন এবং ইংরেজি শিক্ষার যখন সূত্রপাত হয়েছে, তখন তাঁর বয়স নব্বই-এর ওপর। তাঁর যখন মৃত্যু হয়, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একুশ বছরের যুবক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বয়স আঠারো, মধুসূদনের চৌদ্দ, ঈশ্বর গুপ্তের সাতাশ এবং বঙ্কিমচন্দ্র সবে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন।

এই পরিবেশে এবং বাংলা সাহিত্যে যখন মঙ্গল কাব্যের যুগ শেষ হয় নি, তখন তাঁর মনোভাব কতটা অগ্রবর্তী ছিল এবং তাঁর ভাষা আর ষ্টাইল ছিল কত আধুনিক, তা তাঁর গানগুলি শুনলে বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করছি।—

নয়নেরে দোষ কেন

মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন
আঁখি কি মজাতে পারে না হ'লে মনমিলন ॥
আঁখিতে যে যত হেরে সকলই কি মনে ধরে
সেই যাকে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন ॥

*

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্কছলে ॥
সৌরভে গরবে কে তব তুলনা হ'বে
আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে ॥

সে কেনরে করে অপ্রণয়
ও তার উচিত নয় ॥
জানি আমি তার সনে কভু তো বিচ্ছেদ নয় ॥
কখন কি বলেছি মানে আজ কি তা আছে মনে
তা বলে কি মানে মানে অভিমানে রইতে হয় ॥

*

বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা
প্রেম গেল কেন প্রাণ গেল না ॥
হইয়ে বহিয়ে গেছে প্রেম ফুরায়েছে
রহিল কেবলি প্রেমেরি নিশানা ॥

*

তবে প্রেমে কি সুখ হ'ত
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত ॥
ফুল ফুটিত চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিত ॥
প্রেম সাগরের জল তবে হইত শীতল
বিচ্ছেদ বড়বানল যদি তাতে না থাকিত ॥

*

তাহারে কি ভুলিতে পারি
যাহারে আমি সঁপিলাম মন
দেখিতে যার বদন অতি কাতর নয়ন
শুনিতে বচনসুধা শ্রবণ তেমন ॥
দেখিলাম কতমত নাহি দেখি তার মত সেজন এমন
যদি তার বিরহেতে সতত হয় জ্বলিতে
জ্বলিতে জ্বলিতে হ'বে নির্বাণ কখন ॥

*

মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না

চাতকীর ধারা জল তাহাতে হয় শীতল
সেই বারি বিনা আর অন্য বারি চায় না ॥

এই সব গানই খুব সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লেখা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ষাটের কোঠায় পা দিয়েছেন। ষাটের পরে সাধারণত বেশি গান গাওয়া বা রচনা করা হয়ে ওঠে না। বড় জোর আরও বছর ছয় সাত তিনি গান লিখেছিলেন! তাঁর সমস্ত রচনা ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই শেষ হয়েছিল এইটা মনে করাই সমীচীন। তাঁকে প্রধানত অষ্টাদশ শতাব্দীর লোকই আমরা বলিতে পারি। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। এই যে অত্যন্ত সংক্ষেপ রচনা অথচ তার মধ্যে সুগভীর ব্যাপকতা এইটি সেকালের সাহিত্যে দুর্লভ। ভাষার দিক থেকেও দেখা যায় নিধুবাবুর প্রচেষ্টা ছিল মার্জিত, সরল এবং মধুর। সেকালের সেই লম্বা লম্বা পয়ার ঘেঁষা কাব্যের ধারা থেকে নিধুবাবুর ষ্টাইল একেবারেই স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণ আধুনিক এবং নতুন সৃষ্টি। এ যুগের গীতি কবিতা এই গতিকেই অনুসরণ করেছে। এই কারণেই নিধুবাবুকে আধুনিক কাব্য সঙ্গীতের আদি কবি বললে অত্যুক্তি হয় না।

নিধুবাবু যখন রচনা আরম্ভ করলেন তখনও বাঙলা গান সম্বন্ধে একটা সচেতনতা আসে নি। খেউড়, কবি আর পাঁচালি নিয়ে লোকে মাতামাতি করত। একটু উচ্চ শ্রেণীর গান ছিল "আখড়াই" নামে পরিচিত। এতে গাওয়ার ঢং ছিল রীতিমত ওস্তাদি। নিধুবাবু প্রথম দিকে আখড়াই গানে উঁচুদরের সুর সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছিলেন, পরে বোধ হয় রুচির মিল হয় নি বলেই ছেড়ে দেন। এই সময়ে তিনি অনেক ছাত্র গড়ে তুলেছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। মোহনচাঁদ বসু ছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য। আসরে নিধুবাবু এসে বসলে যেন একটা নতুন প্রাণ সঞ্চার হ'ত। ক্রমে তিনি মস্তবড় একটা সঙ্গীতবোধ এনে দিতে পেরেছিলেন দেশে।

নিধুবাবুর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি সুপুরুষ ছিলেন এবং গানবাজনা নিয়ে নানা সমাজে মেলামেশা করতেন সুতরাং নানারকম রটনা হ'তে বিলম্ব হয় নি। শ্রীমতী নামে এক গণিকার সঙ্গে তাঁর সুগভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ইনি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর গণিকা ছিলেন এবং নিধুবাবু এঁর প্রেরণায় বহু গান রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। এর মধ্যে "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে" গানটি বিশেষ বিখ্যাত। এই গানটি সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে সেটি হ'চ্ছে এই যে, একবার বহুদিন অদর্শনের পর নিধুবাবুর দেখা পেয়ে শ্রীমতী অশ্রুভরা কণ্ঠে বল্লেন—"এতদিনে কি মনে হ'ল তাই বুঝি দেখা দিতে এলে," এরই উত্তরে নিধুবাবু রচনা করলেন—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে
বিধুমুখে মধুর হাসি দেখতে বড় ভালবাসি
তাই তোমারে দেখতে আসি দেখা দিতে আসিনে।"

এই গানটি শ্রীধর কথক কিঞ্চিৎ ভাষান্তরিত ক'রে গাইতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খাতায় এই পরবর্তিত গানটি পাওয়া গেছে ঃ—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে
আমার সে ভালবাসা তোমা বই আর জানিনে
বিধুমুখের মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
তাই—আমি দেখতে আসি—দেখা দিতে আসি নে।

যেহেতু শ্রীধরের খাতায় এ গানটি পাওয়া গেছে সেহেতু অনেকেই অনুমান করেন যে এ গান শ্রীধরের রচনাকিন্তু এ গানটি বহুকাল থেকে নিধুবাবুর নামে প্রচলিত এবং পূর্বোক্ত পাঠটিই সাধারণত গাওয়া হয়ে থাকে। এই কারণে এটাই সঙ্গত মনে হয় যে শ্রীধর নিধুবাবুর গানটিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ক'রে ব্যবহার করেছেন।

নিধুবাবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবেশ অনুযায়ী মুখে মুখে গান রচনা করতেন এবং শীঘ্রই সে গান প্রচারিত হ'য়ে যেত। যথা সময়ে

লিখে না রাখার দরুন পরে আর সে-সব গান নিজের বলে দাবী করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'ত। এইভাবে বহু গান হস্তান্তরিত হবার ফলে অবশেষে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি তাঁর প্রচলিত গীত-সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থের নাম "গীতরত্ন"। দুঃখের বিষয় এ গ্রন্থে তাঁর নামে প্রচারিত বহু বিখ্যাত গান সন্নিবেশিত হয় নি—তার কারণ সে-সব গান তিনি লিখে রাখেন নি।

যাই হোক, নিধুবাবু শ্রীমতীর প্রতি আসক্ত থাকলেও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে উপলক্ষ্য করেও নিধুবাবু অনেক গান রচনা করেছেন। এর মধ্যে "তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ" গানটি বিশেষ বিখ্যাত। কথিত আছে যে একবার তিনি দিনকয়েক বাড়ি ফিরতে পারেন নি,—পরে যখন ফিরলেন তখন অভিমান ভরে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বল্লেন—"আমি কুৎসিং তাই বলে কি এমন ঘৃণা করতে হয়?" এই অভিমানকে উপলক্ষ্য করেই তিনি নাকি উক্ত গানটি রচনা করেন।

আর একটা অদ্ভুত ধারণা লোকের আছে,—সেটা হচ্ছে এই যে, নিধুবাবুর রচনা অশ্লীল। নিধুবাবুর গীত-সংগ্রহের অনেক গ্রন্থ আছে, সেগুলি অনুসন্ধান করে এমন একটি গানও পাওয়া যায় না, যাকে অশ্লীল তো দূরের কথা, ইতরও বলা চলে। অথচ নিছক প্রেমের এবং প্রগাঢ় ভালবাসার গান বলেই তা অশ্লীল বলে পরিচিত। ভারত-চন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সে যুগের অপরাপর কবিগণ সকলেই সোজা-সুজি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে গেছেন তাতে দোষ হয় নি, কিন্তু দোষ পড়ল নিধুবাবুর ওপর সবচেয়ে বেশি করে অথচ তিনিই বোধ হয় অশ্লীলতাকে পরিহার করেছিলেন বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে। আর এমন মার্জিত রুচি এবং ষ্টাইলের পরিচয় দিয়েছিলেন, যা অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে বিরল। তিনি ঠাকুর দেবতার দোহাই দিয়ে বা রাধাকৃষ্ণের লীলার আড়ালে যদি এই সব গান লিখতেন, তবে হয়তো

এতটা নিন্দে রটত না ; কিন্তু এমনি করে আমাদের নিজেদের অন্তরের ভাব ফুটিয়ে তুলেই বোধ হয় নীতিবাগীশদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন। যাঁরা এগিয়ে চলেন, পিছনের লোক এমনি করেই তাঁদের নিন্দে রটায়। আর একটা কারণও আছে। নিধুবাবু কখনও পেশাদার গাইয়ে ছিলেন না, তার ওপরে ছিলেন শিক্ষিত ব্যক্তি। এই কারণে অভিজাত মহলে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল প্রচুর। যাঁরা তাঁর গান গাইতেন বা তাঁর কাছে শিখতেন, তাঁরা প্রায়ই ছিলেন সম্ভ্রান্ত ঘরের, কিন্তু এঁদের চরিত্র সবক্ষেত্রে যে নিষ্কলঙ্ক ছিল, এমন কথা কেউ বলবে না। ক্রমে সমাজের নৈতিক অধঃপতন যখন শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে, তখন সমাজ-সংস্কারকদের প্রবল আন্দোলনে সংযমের কাঠিন্যটা আবার একটু বাড়াবাড়িতে এসে ঠেকল। এই সময়েই যাবতীয় ভালবাসার গান বর্জিত হতে লাগল উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এবং সেই সঙ্গে নিধুবাবুর গানও ত্যজ্য পদার্থ বলে গণ্য হ'ল। আমাদের সাহিত্যেও এইরকম বাড়াবাড়ির পরিচয় আছে। এই সেদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকেও অশ্লীলতা দোষে অভিযুক্ত করতে ছাড়েন নি একশ্রেণীর বিপরীত-বোদ্ধা সমালোচক।

যেমন সাহিত্যের দিকে তেমনি সঙ্গীতের দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে নিধুবাবুই একটা নতুন পথের নির্দেশ দিয়ে গেলেন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর আখড়াই, খেউড়, কবি, পাঁচালীর যুগে বাস করে। সেকালে খুব উচ্চশ্রেণীর আসরে বোধ হয় ধ্রুপদ জাতীয় গানেরই চলন ছিল বেশি। এইসব গান বাঁধা হ'ত প্রধানত ব্রজবুলি পদে, তাতে কাব্যের স্পর্শ প্রায়ই থাকত না। ধ্রুপদের চাল মন্থর, ভাব গম্ভীর এবং রসটাও প্রধানত শান্ত। এতে বেশ ভারি চালের বা ভক্তিরসের গান যেমন জমত প্রণয়ের ব্যাকুলতা আর করুণ ভাবটা তেমন করে ফুটে উঠত না। এই মস্ত বড় অভাব মিটিয়ে দিলে টপ্পার দানাদার তান। এক একটি তানের ভিতর দিয়ে এক একটি ব্যাকুলতা যেন মর্ম স্পর্শ করে যায়। নিধুবাবু বুঝতে পারলেন যে, বাঙলার মত

নমনীয় ভাষায় টপ্পার মাধুর্য ঢেলে দিতে পারলে সে গান প্রাণকে একেবারে গলিয়ে দিতে পারবে। তাই এদিকটাতেই তিনি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। টপ্পার মধ্যেও আবার নিধুবাবুর টপ্পা অন্য জিনিস। তিনি তেমন গোঁড়াভাবে পশ্চিমী টপ্পার অনুসরণ করেন নি। ওদিককার টপ্পার দ্রুত তানের কাজটা বেশি, কিন্তু নিধুবাবুর টপ্পায় এক একটি সুরের ওপর আলাদা আলাদা আন্দোলন, তাতে করে গানের করুণ রসটি যেন আরো নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে আসে। উঁচু দরের গানের মধ্যে বাঙলার নিজস্ব জিনিস হচ্ছে টপ্পা। ধ্রুপদের চর্চা এদেশে যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু টপ্পার মত এমন জনপ্রিয়, এমন আপনার জিনিস ধ্রুপদ হতে পারে নি। বাঙালীর ভাবুকতা সমস্তটা টপ্পার রসে ঢালা। আগমনীর গান, শ্যামাসঙ্গীত, প্রাচীন কাব্যসঙ্গীত সবই টপ্পার স্পর্শে মধুর হয়ে উঠেছে। নিধুবাবুর পরে তাঁর অনুকরণে বহু গান রচিত হয়েছে, তবে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে টপ্পার প্রয়োগ নতুন বৈশিষ্ট্যে আর দেখা যায় নি। এযুগে অতুলপ্রসাদ সেনও টপ্পার সুললিত কাজ এনেছেন তাঁর অপূর্ব ঠুংরীভঙ্গিম গানে।

শেষ জীবনটা নিধুবাবুর লোকচক্ষের আড়ালে কেটেছিল বলে মনে হয়, কেননা গাইবার ক্ষমতা লোপ পাবার পরও বহুদিন তাঁকে বাঁচতে হয়েছিল। নিধুবাবুর মৃত্যুর কিছুকাল পরে ঈশ্বর গুপ্ত যখন তাঁর সম্বন্ধে লেখেন তখন তাঁর গানের প্রচার যতটা ছিল, তাঁর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ততটা ছিল না। লোকের রুচি এই সময়ে দ্রুতগতিতে পাল্টাতে আরম্ভ করেছে। পুরোনো সব কিছুর প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞার ভাব এনে দিয়েছিল নতুন যুগের শিক্ষার প্রেরণা। নতুন যুগের এই পরিবর্তনটা যদি এমনি হঠাৎ আর এমনি বিপুলভাবে না আসত, তবে হয়তো তার অব্যবহিত পূর্বের সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত এভাবে লুপ্ত হয়ে যেত না।

পাঁচালীকার দাশরথি রায়

"পাঁচলী" শব্দটি নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে কিন্তু কেউ কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি—আসতে পারাও সম্ভব নয় কেননা কি ভাবে যে "পাঁচালী" কথাটি এল তার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে অনুমান ছাড়া আর কিছুই আমরা করতে পারি না। পাঁচালীর শুদ্ধ নাম হ'চ্ছে পঞ্চালী বা পঞ্চালিকা। মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা বলেছেন—"পাঁচালী প্রবন্ধ"। সঙ্গীতের দিক থেকে প্রবন্ধ বলতে যে-কোন গীতরূপ বোঝায় অর্থাৎ আজকালকার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি থেকে সারি, জারি, বাউল, ভাটিয়ালি সবই এক একটি প্রবন্ধ। সে যুগে প্রচলিত নানা প্রবন্ধাদির মধ্যে পাঁচালীও একটি প্রবন্ধ। এখন কথা হচ্ছে পাঁচালী কথাটি প্রচলিত হবার আগে এই পদ্ধতি কি নামে পরিচিত ছিল এবং পরবর্তী পাঁচালীর সঙ্গে তার পূর্ববর্তী রূপের সাদৃশ্য কতখানি। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার কেননা এই সম্বন্ধটিই স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা যাচ্ছে না। আমরা আমাদের কল্পনা অনুযায়ী পাঁচালীর নানারকম ইতিহাস খাড়া করছি।

এ অনুমান কিন্তু ঠিক যে এই ধরনের গীতরীতির উদ্ভব বহু প্রাচীনকালে হয়েছে। আগেকার দিনে "প্রবন্ধ" ছিল তিন রকমের—সূড়, আলি এবং বিপ্রকীর্ণ। "আলি" নামটি কেন হ'ল সেটা বলা শক্ত কেননা এ সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই। এই-জাতীয় গান-গুলি প্রায়ই নানা তালে গাওয়া হ'ত এবং তাল ছাড়া আলাপের ঢঙেও বিস্তারিত হ'ত। অনেক গান ছিল রীতিমত লম্বা ধরনের অনেকক্ষণ ধরে গাইতে হ'ত। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে "আলি"-জাতীয় প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল চব্বিশ। এরই একটি রূপ হ'চ্ছে "পঞ্চ-তালেশ্বর"। "আলি"-জাতীয় "পঞ্চতালেশ্বর" প্রবন্ধ ক্রমে "পঞ্চালি"

(পঞ্চালী) বলে পরিচিত হয়েছিল—এমন অনুমান করাও নেহাৎ অসঙ্গত নয়। এই সব প্রবন্ধ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। "পঞ্চতালেশ্বর" গীত রূপটি ছিল মঙ্গলবাচক। এর পাঁচটি পদ বিভিন্ন তালে বিভিন্ন বাদ্য সহযোগে গাওয়া হ'ত। এই সব বাদ্যের মধ্যে ছিল পটহ, হুড়ুক্কা, শঙ্খ, কাঁসি ইত্যাদি। এই প্রবন্ধ বীর এবং শৃঙ্গার এই দুটি রসেই বিরচিত হ'ত। গীতারম্ভে পঞ্চতালেশ্বর প্রবন্ধে তালের সংযোগ থাকত না অর্থাৎ রাগালাপের পর তাল সহযোগে গান আরম্ভ হ'ত। পঞ্চতালেশ্বর প্রবন্ধ বাংলাতে এক সময় বিশেষ প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে এইসব গীতরূপ নানাভাবে ভেঙেচুরে মিলেমিশে একাকার হ'য়ে যায়, ফলে শ্রেণীবিভাগ আর ঠিক রইল না। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় পঞ্চতালেশ্বর প্রবন্ধের নাম মাত্র জানা ছিল, "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে এর উল্লেখমাত্র করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থেই পাঁচালীকে ক্ষুদ্র গীতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু তার বর্ণনা দেওয়া হয় নি। ক্ষুদ্র গীত বলতে সাধারণ কাব্য-সঙ্গীত অর্থাৎ গানের কলি এবং তালের সমন্বয় বোঝায়। এই ক্ষুদ্র গীত ছিল চার প্রকার—চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুপদ আর পাঁচালী (পঞ্চালী)। এই পঞ্চালীর রীতিও ক্রমে অনেক পরিবর্তিত হয়ে দাশরথির সময় ছড়া-কাটায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং এইসব ছড়ার মাঝে মাঝে ছিল এমন গান যা কাব্য-সঙ্গীতের কোঠায়ও ওঠে নি। দাশরথির প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি এইসব গানকে কাব্যসঙ্গীতের স্তরে উন্নীত করতে চেষ্টা করে অনেক পরিমাণে সাফল্য অর্জন করে-ছিলেন এবং পাঁচালীর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও এইসব গানে রাগ-সঙ্গীতের মাধুর্য্য আনতে পেরেছিলেন। শ্রীধর যেমন কথকতায় টপ্পার প্রয়োগে সাফল্য অর্জন করেছিলেন—দাশরথিও তেমনি পাঁচালী গানে চমৎকার টপ্পা প্রয়োগ করে একটি বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেছিলেন। "ননদিনী বোলো নগরে" গানটি রীতিমতো টপ্পা অথচ কী মধুর কাব্য-সঙ্গীত। আবার "হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি"—এই

গানটিতে কথকতায় ব্যবহৃত গানের ধরনের মধ্যে রাগ সঙ্গীতের স্পর্শ এনে ঝাঁপতালে একটি পরম রমণীয় রূপ প্রদান করা হয়েছে। পাঁচালী রচনা আরম্ভ করে দাশরথি যৎ তালে বহু গান রচনা করেন। লোকে এই জন্য তাঁর নাম দিয়েছিল "যোতো দাশু"। "যৎ"এ গান মানেই টপ্পা ঢঙের গান। দাশরথির সবচেয়ে বড় প্রয়াস কিন্তু টপ্পায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সৃষ্টি নয়—রাগসঙ্গীতের স্পর্শ দিয়ে পাঁচালীর গানে নতুন নতুন আবেদন আনা। এতে তিনি দুটি রীতিরই একটি সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ললিত, বিভাস বা সিন্ধু-ভৈরবীতে যৎ এবং ঝাঁপতালে তিনি এইসব সৃষ্টি করেন। লোকের মনোভাব অনুযায়ী কিভাবে এই সব পালা জমিয়ে তুলতে হয় তার কৌশল দাশরথি চমৎকার জানতেন। তাঁর পাঁচালী থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি, তাহলে বোঝা যাবে দাশরথি কেমন রসাল ক'রে পৌরাণিক কাহিনীগুলি সঙ্গীত সহযোগে বিবৃত করতেন। তাঁর "কালীকৃষ্ণ বর্ণন" পালা থেকেই খানিকটা উদ্ধৃত করি ঃ—

কুটিলা শ্রীমতীর সংবাদ আয়ানে কহেন—

এরূপে কথার দ্বন্দ্ব, উভয়ে কন উভয় মন্দ,
শ্রীগোবিন্দ শ্রীমতীর সঙ্গে।
অন্তরে আনন্দময়, মুখে যেন অপ্রণয়,
নানা কাব্য করে রঙ্গ ভঙ্গে॥
হেথা কুটিলে কুচক্রী ব্রজে, ভ্রান্তা হয়ে হৃদি মাঝে
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কথা শুনি যত।
চলে মনের রাগে রাগে, ভবনে পবন বেগে,
আয়ানকে কহিল গিয়া দ্রুত॥
বলে শুনগো শুনগো দাদা, তোমার কলঙ্কিনী রাধা,
তার জ্বালায় আর মুখ দেখাতে নারি।
এখন দেখে আইলাম বনে, এমনি ঘৃণা হতেছে মনে,
সেই বা মরে আমরাই বা মরি॥

কত অন্য লোকে ধিক্ দিয়ে, বলিতাম আমরা মায়েঝিয়ে
পরের মন্দ দেখে আসিতাম হেসে।
এখন লোকে উল্টে বলছে কত, সয়ে থাকি চোরের মত,
বাঁদির কুরূপ পর হয়েছি রাধার দোষে॥
তোর নারী সে রাজার ঝি, ছি ছি রাধা কর্‌ল কি,
রাখাল লয়ে বনে বনে ভ্রমে।
কারেই ভাল মন্দ বলি, রাজার বেটী চন্দ্রাবলী,
সেও মজেছে সেই রাখালের প্রেমে॥
তুই করিস নে মনোযোগ, কুপথ্যে বাড়িল রোগ,
দমন হৈলে এমন হতো কি তবে।
মেয়ে মুখো যার পতি, মাগ হয় তার আত্মমতি,
নহিলে কেন এমন দশা হবে॥
ভগ্নী বাক্যে অগ্নি প্রায়, আয়ান বলে হায় হায়,
এমন বাক্য আমায় বলে কেটা।
আমি আয়ান পাষাণ বুকো, আমায় বলে মেয়ে মুখো,
চল দেখি কোন স্থানে নন্দের বেটা॥
বাক্য মোর ব্রহ্মবেদ, করিব গে তার শিরশ্ছেদ,
সে যেমন শিরকাটা করিল কর্ম।
কাটিব কলঙ্কী রাধারে, স্ত্রীহত্যা ঘটিল মোরে,
আজ আর মানিব না ধর্মাধর্ম॥
বধিব কৃষ্ণে আজি বনেতে, যষ্টি কিম্বা মুষ্ট্যাঘাতে,
আমার হাতে আজি কি সে আর বাঁচে।
মনে বুঝিলাম নিঃসন্ধ, নির্বংশ হইল নন্দ,
সাধ্য কি বাঁচে যম তারে ডেকেছে॥
তার পুতনাদি নষ্ট করা, হাতে গোবর্ধন ধরা,
ভেল্কি করা মোর কাছে [illegible]

করিব পদাঘাতে হাড় চূর্ণ, কংসরাজার বাঞ্ছা পূর্ণ,
বুঝিলাম আজি আমা হতেই হবে ॥
ক্রোধে আয়ান দর্প করি, যায় যথা দর্পহারী,
কুচক্রী কুটিলে যায় সনে।
হস্তে লৈয়া কালসাট, ঘন মারে মালসাট,
কাট কাট শব্দে যায় বনে ॥
দূর হতে দেখি প্যারী, অঙ্গ কাঁপে থরহরি,
ব্যাঘ্র হেরি হরিণী যেন করে।
ধরিয়ে হরির পায়, চঞ্চল হরিণী প্রায়,
বলে হরি রক্ষা কর মোরে ॥

সিন্ধুভৈরবী —পোস্তা

ঐ দেখ আসছে আয়ান, বংশীবয়ান, বনমাঝে।
বিপদে যায় হে জীবন, মধুসূদন, তোমায় ভ'জে ॥
দুষ্ট দেখেছে মোরে লুকাব কেমন করে
কিঞ্চিৎ স্থান আমারে দাও হে অভয় পদাম্বুজে ॥
রাখ হে করুণা করি তব করুণায় শ্রীহরি
সহস্র ঝারিতে বারি এনেছিলাম এই ব্রজে ॥

কৃষ্ণ বলেন চিন্তা নাই, আমি কি ডরাই রাই,
ক্ষুদ্র আয়ানের দর্প হেরি ॥
চিন্তামণি নাম ধরি, ভব চিন্তা নষ্ট করি,
তব চিন্তা কি হেতু কিশোরী ॥
দেখ রাই অপরূপ, সম্বরি এই কৃষ্ণরূপ,
দণ্ডিতে পারিবে কোন রূপে।
শুন রাধা রসময়ী, আমি যার সহায় হই,
তার কি ভয় ইন্দ্র চন্দ্র কোপে ॥

এত বলি ঈষৎ হাসি, ত্যজিয়ে মোহন বাঁশী
মদনমোহন মায়া ছলে।
রাধার ঘুচাতে মনের কালি, হইলেন দক্ষিণে কালী,
মহাকাল পতিত পদতলে॥
জবা জাহ্নবীর জল, সচন্দন বিল্বদল,
প্যারী করে চরণে অর্পণ।
শ্যাম হলেন নিকুঞ্জ শ্যামা, কিবা রূপ নিরুপমা,
আয়ান করিছে নিরীক্ষণ॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কুঞ্জকাননে কালী, ত্যজে বাঁশী বনমালী
করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত।
শ্যাম শ্যামা ভেদ কেন কররে জীব ভ্রান্ত॥
পীতাম্বর পরিহরি, হরি হলেন দিগম্বরী,
মরি মরি হেরি কি রূপের অন্ত।
কিবা কাল শশী, লোলজিহ্বা এলোকেশী,
ভালে শশী অট্টহাসি বিকট দন্ত॥
যে গোবিন্দ পদদ্বয়ে সুগন্ধি তুলসী দিয়ে
সুর নরে সাধে সারা দিনান্ত।
দিয়ে সে চরণে রাঙ্গা জবা রঙ্গিনী রাই করে সেবা
কে পাবে শ্যাম চিন্তামণির ভাবের অন্ত॥

হেরিয়ে আয়ান, ভাসিছে বয়ান
নয়নের প্রেমধারে।
দূরে গেল রাগ, হইল বিরাগ,
রাধারে অনুরাগ করে॥

বলে ধন্যা ধন্যা প্যারী রাজকন্যা,
গিরীরাজকন্যা সাধে।
হরি পরিবাদ, দিয়ে করি বাদ,
তবে কেন সাধে সাধে ॥
ঘুচিল বিকার মনের অন্ধকার,
সব ধন্ধ দূরে গেল।
বলে সার্থক আশা, ফেলে হস্তের আশা,
বলে আশা পূর্ণ হলো ॥
ভাবে গদ গদ, ভাবে তারাপদ,
গলে বাস কৃতাঞ্জলি।
কুটিলেরে ডাকি, বলে বল দেখি,
কই বনে বনমালী ॥

দাশরথি এই পাঁচালী গানে নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর বর্ণ ছিল উজ্জ্বল শ্যাম। চেহারা রোগা লম্বা, চুল কোঁকড়ান আর চক্ষুদুটি ছিল বিশাল এবং বিস্ফারিত। চারিদিকে লোকে তাঁকে ঘিরে বসত—তিনি দাঁড়াতেন ঠিক মাঝখানে। পাঁচালীর প্রত্যেক পদ তিনি তিনবার করে উচ্চারণ করতেন—একবার সামনের দিকে চেয়ে আর দুবার দুপাশে চেয়ে সবাইকে শুনিয়ে। গাইতে উঠে, আবশ্যকতা অনুসারে পাঁচালীর কিছু পরিবর্তন করে নিতেন। শোনা যায় এক বিষয়ের পালা তিনি বড়, ছোট, মাঝারি—এরকম তৈরি করে রাখতেন। বোধ হয় দক্ষিণা অনুসারে পালার আয়তন কতখানি হবে সেটা ঠিক করা হ'ত। এই আর্থিক ব্যাপার নিয়ে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হয়েছে তাঁর জীবনে। তাঁর ছোট ভাই তিনকড়ি ছিলেন ভাল গাইয়ে। দাশরথি ছড়া বলতেন আর তিনকড়ি গাইতেন, তাছাড়া যন্ত্রাদি বাঁধতে ও বাজাতে তিনি নিপুণ ছিলেন। দুভাই মিলে একসঙ্গেই দল চালাচ্ছিলেন কিন্তু শোনা যায় দাশরথি উপার্জিত টাকার অতি অল্পই

তিনকড়িকে দিতেন। তাতে তাঁর সংসার চলত না এবং শেষ পর্যন্ত একটা মতান্তরের ফলে তিনকড়ি দাদার দল ছেড়ে দিয়ে নিজে একটা দল তৈরি করেছিলেন। পাঁচালী গানে দাশরথির সারা বাংলায় প্রতিষ্ঠালাভ হয়েছিল। সেই অনুপাতে অর্থও তিনি কম উপার্জন করেন নি। অনেক জমীদারগৃহ থেকে তাঁর জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল।

দাশরথি বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার কাছে বাঁধমূঢ়া গ্রামে বাংলা ১২১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মামার বাড়ি বর্ধমান জেলার পীলাগ্রামে। দাশরথি বাল্যকালেই তাঁর মামার কাছে চলে আসেন এবং পীলাতেই মানুষ হয়েছিলেন। পীলার পাঠশালায় পড়ে সামান্য ইংরেজিও শিখেছিলেন তিনি এবং এই বিদ্যার জোরে সেখানকার নীলকুঠিতে একটা চাকরিও পেয়েছিলেন—মাইনে পেতেন তিন টাকা।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর গান বাঁধার সখ ছিল। তাঁর এই প্রতিভার পরিচয় পেয়ে অক্ষয়া বলে একটি স্ত্রীলোক তার দলে তাঁকে টেনে নিয়ে আসে। অক্ষয়ার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ক্রমে অতিশয় অশোভন হ'য়ে দাঁড়াল। এই সব কবি গানের সংস্রব থেকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য তাঁর মামা তাঁকে নীলকুঠিতে চাকরি করে দিলেন কিন্তু দাশরথির চাকরিতে মন উঠল না। তিনি কেবল অন্যমনস্কভাবে বসে থাকতেন আর কাজে ভুল হ'ত। শেষ পর্যন্ত চাকরি গেল। দাশরথির তাতে ক্ষোভ ছিল না তিনি আবার অক্ষয়ার দলে ঢুকে পড়লেন।

গ্রামে আর এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক ছিলেন তিনিও ঠেসে অনুপ্রাস লাগিয়ে বেশ কিছু অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ ক'রে গান বাঁধতেন এবং এই করে নামও করেছিলেন। তাঁরই আদর্শ অনুযায়ী দাশরথিও প্রচুর অনুপ্রাস সহযোগে টপ্পা, কবিগান আর কালীকৃষ্ণ বিষয়ক গান রচনা করতে লাগলেন। ক্রমে সেই ভদ্রলোককেও তিনি দক্ষতায় ছাড়িয়ে গেলেন। খ্যাতির প্রথম যুগে এটি দাশরথির কাছে কম গৌরবের বিষয় ছিল না।

ওদিকে মামার শাসনে শৈথিল্য ঘটে নি। কিন্তু, শাসন সত্ত্বেও

দাশরথি অক্ষয়ার দলের সঙ্গে সংযোগ ঠিক রেখেছিলেন যখন চাকরি করতেন তখনও। অক্ষয়ার দলের যেই বায়না হ'ত অমনি সে গোপনে গিয়ে দাশরথিকে নিয়ে আসত। দাশরথি রাত্তিরে পালাতেন আর নীলকুঠিতে ফিরতেন সকাল বেলা। চাকরি যাবার পর মামা খোঁজ নিয়ে জানলেন ভাগ্নে পীলার কাছেই একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকেন এবং সেখান থেকেই গান গাইতে যান। মামা তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে এলেন—অনেক বোঝালেন, তিরস্কার করলেন। গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তি ভৈরব চক্রবর্তীর কাছে তাঁকে নিয়ে গেলেন—তিনিও অনেক সৎপরামর্শ দিলেন; কিন্তু দাশরথি তখন কবিগানে মেতে উঠেছেন, এসব কথা তিনি গ্রাহ্যই করলেন না। তখন চক্রবর্তী মশায় মহা খাপ্পা হয়ে বল্লেন—"যাও, আজ থেকে আর তোমার মুখ দেখব না।" দাশরথি জবাব দিলেন "—এ মুখও আর দেখাবার নয়।" তারপর,— ঝগড়াঝাঁটি যখন হয়েই গেল তখন তিনি প্রকাশ্য ভাবেই কবির দলে যেতে লাগলেন এবং গেয়ে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর প্রতিপক্ষ যাঁরা ছিলেন তাঁরা কবিত্বের দিক থেকে যত না হোক গালাগালিতে তাঁর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রায়ই তিনি যাচ্ছেতাই রকমের গালাগাল খেয়ে আসতেন। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ সন্তানের এ হেন লাঞ্ছনা বড়ই পরিতাপের বিষয় ছিল। তাঁর মামা আর তাঁর বাবার কানেও এসব খবর পৌছোতে দেরি হ'ল না। দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে একদিন তাঁর বাবা আর মামা আবার তাঁকে বোঝাতে বসলেন। বাবা অনেক বুঝিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বল্লেন—"বাবা দাশু, তোমার গর্ভধারিণী পুণ্যবতী ছিলেন—তোমার এসব কেচ্ছা শুনবার আগেই তিনি মরে বেঁচেছেন। আমার পোড়া কপাল এই দেখতে শুনতে বেঁচে আছি।" দাশরথির এবার মনে সত্যিই দুঃখ হ'ল। মার কথা স্মরণ করে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন আর কবির দলে যাবেন না। এর পর থেকে সত্যই আর কবির দলে যান নি।

দাশরথি যখন পাঁচালী গাইতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স

বছর তিরিশ হবে। বছর দুয়েকের মধ্যেই তিনি পাঁচালীতে বেশ নাম করলেন। মামার বাড়ি ছেড়ে পীলাতেই নিজে বাড়ি করলেন। বিয়ে করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসলেন। এবার তাঁর দিন ফিরল। অর্থোপার্জন হ'তে লাগল প্রচুর। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। এর ফলে সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা বাড়ল। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, কাশীমবাজার, কলকাতার শোভাবাজার—এসব জায়গা থেকে তাঁর প্রচুর প্রশংসা এবং অর্থাগম হ'ল। গ্রামে তাঁর মাটির ঘর ছিল, এবার ঘর বাড়ি পাকা হ'ল। যাঁরা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন ক্রমে তাঁরাও খুশি হলেন। সেই ভৈরব চক্রবর্তী যিনি তাঁর মুখ দেখবেন না বলেছিলেন তিনিও একদিন তাঁর কলঙ্কভঞ্জন পাঁচালী শুনে নিজের গায়ের শাল-জোড়া তাঁর গায়ে পরিয়ে দিলেন।

পরবর্ত্তী জীবন তাঁর সুখে এবং সম্মানের সঙ্গেই কেটেছে। ১২৬৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কাশীমবাজারে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গান করতে গিয়েছিলেন—পীলায় ফিরলেন জ্বর নিয়ে। যখন বুঝলেন এ জ্বর আর সারবে না, তখন নিজেই গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করলেন। গঙ্গাতীরে তিনি যখন শেষ শয্যায় শায়িত তখন একজন লোক তাঁর অদূরে বসে তাঁরই রচিত একটি গান গাইছিলেন। সেটি শুনতে শুনতেই দাশরথি শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

দাশরথি তাঁর স্ত্রী এবং একটি মাত্র কন্যাসন্তান রেখে যান।

দাশরথির সমসাময়িক কবি হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত বিশেষ পরিচিত ছিলেন কিন্তু পাঁচালীর সুরকার হিসাবে রসিকচন্দ্র রায়ের নাম সে যুগে দাশরথির পরেই করতে হয়। এঁর কয়েকটি গান অতি চমৎকার; উদাহরণ স্বরূপ "দে গো বৃন্দে আমায় দে নারী সাজায়ে" (এ গানটির আমরা এ পাঠই শিখেছি কিন্তু "বাঙালীর গান" নামক গ্রন্থে এ গানটির "দাও হে বৃন্দে, নারী সাজায়ে,' এই রকম পাঠ দেওয়া আছে) গানটি বা "কি হবে কি হবে ভবরাণী ভবে"—এই সব গানের উল্লেখ করা যায়। এসব গান এখনও মাঝে মাঝে রেডিওতে শুনি। রসিকচন্দ্রের

সঙ্গে দাশরথির মাঝে মাঝে দেখাও হ'ত এবং সঙ্গীত সম্বন্ধীয় আলোচনাও হ'ত।

সঙ্গীতের প্রয়োগশিল্পের দিক থেকে দাশরথি টপ্পার কলাকৌশল গ্রহণ করলেও ওস্তাদির দিকে ঝোকেন নি। তাঁর আবেদন ছিল মানবিক। রাগসঙ্গীতকে তিনি নানাভাবে কখনো টপ্পা কখনো খেমটা ঢঙে কাব্যসঙ্গীতের স্বাভাবিক এবং সাধারণরূপের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন।

যাত্রাওয়ালা গোপাল উড়ে

(সাধারণত "আড়-খেমটা" শুনেই আমাদের পিউরিটান পাঠক-সম্প্রদায় ভুরু কুঁচকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ও নামটা যেমনই হোক্ ওর ধরনটা কিন্তু খুব ইতর নয়। বহু বহু নির্দোষ, নিটোল, রসাল এবং মধুর গান আছে এই আড়-খেমটা চালে। এক সময় এই আড়-খেমটারই একটি যুগ ছিল। খুব সরল সুন্দর কোমল ভঙ্গীতে এইসব গান গাইতেন না এমন সুরশিল্পী খুব কমই ছিলেন সে যুগে,—অবশ্য পাষাণহৃদয় ওস্তাদ-পন্থীরা ছাড়া।) তাঁদের কথা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র কেননা, তাঁদের মর্মে আঘাত হানতে হলে হয়তো তিন-সপ্তকব্যাপী গমক প্রকম্পিত বিরাটকায় তান-শেল নিক্ষেপ করবার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সেই সব দিঙ্-নাগাচার্যদের আজ দূর থেকেই নমস্কার করে মাপ চাইছি।

(এই চালের গানে যাঁরা মোহিত হয়েছেন, এমন কি নিজেরা এই ভঙ্গীতে গান রচনা করেছেন,—তাঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং কবিগুরু। তাঁর "হেলা ফেলা সারা বেলা একি খেলা আপন সনে", "দুজনে দেখা হ'ল মধু যামিনীরে", "ও কেন চুরি করে চায়" প্রভৃতি গানের মত সুললিত আড়-খেমটা চালের গান বাংলার সঙ্গীতে বিরল। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে এই শ্রেণীর গানের একটি প্রাবল্য ছিল। খুব সহজ সরল অল্প দু-চার কথায় অনেকখানি ভাব ভরে দেওয়া সাদামাটা কালাংড়া কিম্বা সিন্ধু-খাম্বাজে রচিত গানগুলি প্রাণে যেন মধু বর্ষণ করত।)

তালের দিক থেকে আড়-খেমটাকে একতালার রূপান্তর বলা যায় অথবা দাদরার রকমফেরও বলা যেতে পারে। আড়-খেমটার "আড়ি" বলতে যেটুকু বোঝায় সে হ'চ্ছে গানটা ধরবার সময় ঠিক প্রথম মাত্রায় না ধরে দুটো মাত্রা ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় মাত্রায় ধরা এবং মাঝে মাঝে

আড়ির সৃষ্টি করে একটি ছন্দবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। উদাহরণস্বরূপ একটি প্রাচীন গানের এক অংশ উদ্ধৃত করিঃ—

0 0 শূ | ণ্য প্রা ণে | চ লে 0 | গে ল 0
0 0 ন | য় নে তার্ | অ 0 শ্রু | জ ল 0

সুরের দিক থেকে দেখলে এই ধরনের গানকে টপ্পার পরিণতি বলা যায় কেননা বহু আড়-খেমটা রীতিমত টপ্পার ভঙ্গিতে গাওয়া হয়ে থাকে।

(আড়-খেমটা ভঙ্গিটি অবশ্য নিধু-বাবুর সময়ে তেমন প্রাধান্য লাভ করে নি। এ চালটি প্রচলিত হ'ল যাত্রা এবং নাট্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। বর্তমান আড়-খেমটা ভঙ্গির প্রকৃষ্ট পরিণতি হয় গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালার গানগুলিতে। একমাত্র এই রসসৃষ্টির গুণেই গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। বিদ্যাসুন্দর পালার বহু গানে আড়-খেমটার নানা ভঙ্গি দেখা যায় এবং সেগুলি এতই রসোত্তীর্ণ হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে তার সুর এবং ভঙ্গি বিভিন্ন গানের সঙ্গে মিশে আড়-খেমটাকে আমাদের গানে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে। গিরিশ ঘোষের নাটকের বহু গানেও এই ভঙ্গিটি যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে।)

(গোপাল উড়ের জীবনকাহিনী অল্প যেটুকু পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় লোকটি বিশেষ প্রতিভাবান্ এবং যে সুযোগ তাঁর জীবনে এসেছিল তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন।)

প্রায় আঠারো'শ তিরিশ-পঁয়ত্রিশ সালের কথা। বউবাজারে তখন যাত্রা-গানের আসর খুব জমজমাট। দলে অনেক বড়লোক, বউবাজারের মতিলাল পরিবার, বাঁড়ুজ্যে গোষ্ঠী এবং ধরদের বাড়ির অনেক বাবু এইসব আসর সরগরম করতেন। অনেকেই ছিলেন কৃতবিদ্য। শোনা যায়, "টেলিমেকস্"-এর অনুবাদক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই সখী সেজে আসর মাত করতেন। দলের

মধ্যমণি ছিলেন রাধামোহন সরকার। তিনিই গড়ে তুলেছিলেন "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রার প্রথম পালা। অনেকের মতে এই বিদ্যাসুন্দর পালাই বাংলায় প্রথম সৌখীন যাত্রা। এটা অবশ্য ঠিক নয়, তবে এটা সত্যি যে বিদ্যাসুন্দরের মত এমন জনপ্রিয় পালা এর পূর্বে আর আত্মপ্রকাশ করে নি।

রাধামোহনের বয়স তখন অল্প, বিলক্ষণ টাকা এবং যাত্রার শখ প্রচুর। অতএব সারাদিন যাত্রার বৈঠক চলত। এখান ওখান থেকে অভিনেতা সংগ্রহ করার চেষ্টাও কম ছিল না। ভাল গলা পেলেই তাকে ধরে এনে একবার "ট্রায়াল" দেওয়া ছিল অবশ্য কর্তব্য। দিনের বেলায় এইসব ব্যাপার আর রাত্তিরে চলত আসল আখ্ড়াই অর্থাৎ বড় রকমের রিহার্সেল।

উৎসাহটা সবাকারই খুব প্রবল। দুপুরবেলা বৈঠক জমেছে। সব আয়োজনই প্রস্তুত, কিন্তু অভাব হচ্ছে একটি নিখুত সুরেলা গলার। উৎকৃষ্ট অভিনেতার বা গায়কের অবশ্য অভাব নেই কিন্তু তবু আরো ভালো হ'লে যেন যাত্রাটা পুরোপুরি খুলত—এমনি ভাব-খানা। বাবুরা নানা চিন্তা এবং আলোচনায় মশগুল এমন সময় পথে এক ফেরিওয়ালার গলা শোনা গেল "চাঁপাকলা,—চাই চাঁপা কলা"। দলের একজন প্রধান মাতব্বর বিশ্বনাথ মতিলাল সেই আওয়াজ শুনেই লাফিয়ে উঠলেন। চাঁপাকলার জন্য নয়—গলাটা যেন তাঁর কানে হঠাৎ মধুবর্ষণ করল। এমনি মিষ্টি গলারই খোঁজ খবর চলছিল তখন। বিশ্বনাথ মতিলাল তৎক্ষণাৎ হাঁক পাড়লেন—"ওরে কে আছিস রে, 'গান্ধার' বলেছে, চাঁপাকলাওলাকে ধরে আন"। সঙ্গে সঙ্গেই লোকজন গিয়ে ধরে নিয়ে এল চাঁপাকলা-ওলাকে। ছেলেটির বয়স অল্প—বড় জোর আঠারো উনিশ। দেখতে খাটো, ছিপ-ছিপে গড়ন, রং ফর্সা। মেয়েদের পার্টে খাসা মানাবে। বাবুদের মনে ধরে গেল কলাওলা ছোকরাকে।

"কি নাম হে তোমার ?"

"আজ্ঞে গোপাল।"

"বাড়ি কোথায় ?"

"কটক জেলার জাজপুর গ্রামে।"

"ও বাবা, এ যে আবার উড়িষ্যাবাসী।"

—একটু নিরুৎসাহ হলেও বাবুরা হাল ছাড়েন না—"বাংলা বলতে কইতে তো ভালই পার দেখছি।"

"আজ্ঞে তা পারি।"

"তা তোমার গলাটি তো খাসা,—এক "চাঁপাকলা" ডাকেই ধরে ফেলেছি। বলি গান টান জানা আছে তোমার ?"

এইবার ঘরের দিকে চেয়ে গান বাজনার নানা সাজ-সরঞ্জাম দেখে আসল ব্যাপারটা বুঝতে গোপালের বিলম্ব হয় না, কিন্তু গান টান যেমনই জানুক এ সুযোগ ছাড়বার পাত্র সে নয়। একটু লাজুক ভঙ্গিতে উত্তর দিল—"আজ্ঞে তেমন কি আর জানি, তবে আপনাদের আশীর্বাদে চেষ্টা করলে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ হবে বৈকি, নিশ্চয় হবে।" বাবুরা বিলক্ষণ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন—"তা তোমার আর কে আছে হে ? বলি বিয়ে টিয়ে করেছ নাকি ?"

লজ্জিত গোপাল উত্তর দিল—"সেটি অনেক দিনই হয়ে গেছে আজ্ঞে।"

তাতেও কোন বাধা ঘটল না। সেকালে যে কোন লোকেরই বিয়ে করার দরুন কোন বিপত্তি ঘটত না। সবই ঠিক ঠাক হয়ে গেল এবং সেইদিন থেকেই কলার ব্যাপারী গোপাল উড়ে চাঁপাকলা থেকে একেবারে ললিতকলার ব্যাপারে প্রমোশন পেয়ে গেল।

বাবুরা কিন্তু গোপালকে ট্রেনিং দিয়েছিলেন চমৎকার। ঝাড়া দুটি বচ্ছর বৈঠকের ওস্তাদ হরিকিষণ মিশ্রের কাছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তালিম নিলে গোপাল। ইতিমধ্যে সে দলের সবাইকার চেয়ে সেরা গুণী হয়ে উঠেছিল,—পার্ট শুনলে ধরবার উপায় নেই যে, সে উড়িয়া,

এমনি তার দখল হয়েছিল বাংলা ভাষায়। বেশভূষায় চালচলনে গোপাল একেবারে বাঙালী বনে গেল। বসে বসে যাত্রা গানের রিহার্সেল দিয়েই গোপাল মাইনে পেত দশ টাকা। সেকালে এই মাইনে বড় কম নয়।

দুটি বছর ধরে বহু পরিশ্রম এবং বহু যোগাড়যন্তরের পর রাধামোহন সরকারের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার অভিনয় আরম্ভ হ'ল। প্রথম অনুষ্ঠান রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে—বিরাট ব্যাপার, বহু সম্ভ্রান্ত জনসমাগম, তেমনি বনেদী ব্যবস্থা। আলোয় আলোয় আসর একেবারে স্বপ্নপুরী। প্রভূত শিষ্টাচারপরিবেশিত বাবুরা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বিশ্রম্ভালাপের সঙ্গে যাত্রা উপভোগ করছেন,—চিকের আড়ালে গৃহিণীরা পরিচারিকাদের সঙ্গে যাত্রার দলের ছোকরাদের চেহারা নিয়ে আলোচনা করছেন,—এমন সময় মালিনীবেশী গোপালের প্রথম আবির্ভাব ঘটল। কী চেহারা, কী গান আর কী "এ্যাক্টিং"! বাবুরা রসবিহ্বল, গৃহিণীরা আনন্দে আত্মহারা,—ইতরজনের তো কথাই নেই। গোপালের তো একেবারে জয়জয়কার, আর রাধামোহনকে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। কোনো ছেলে কি এমনি নিখুঁতভাবে মেয়েদের অভিনয় করতে পারে! হ্যাঁ একখানা তালিম বটে! সাবাস্ রাধামোহন সরকার। সঙ্গে সঙ্গে গোপালের বেতন দশ থেকে একেবারে পঞ্চাশ! ভাবুন একবার ব্যাপারখানা।

রাধামোহন নিজে আরও দুবার যাত্রার ব্যবস্থা করেছিলেন খুব ধুমধাম করে,—একবার হাটখোলার দত্তবাবুদের বাড়ীতে আর একবার সিমুলিয়ার ছাতুবাবুর বাড়ীতে। লক্ষাধিক টাকা তিনি কেবল এইসব যাত্রার ব্যাপারেই খরচ করেছিলেন। তারপর একদিন দীপ নিব্‌ল। রাধামোহন মারা গেলেন মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে।

প্রভুর মৃত্যুতে গোপাল একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হারালেন বটে, কিন্তু ক্ষতি তাতে তাঁর বিশেষ হয় নি। সরকার পরিবারের ঔদার্যে গোপাল যাত্রার সমস্ত আসবাব, সাজ-সরঞ্জাম পেয়ে গেলেন এবং

এবারে দল গড়লেন নিজের মনের মতন করে। (বিদ্যাসুন্দর পালা সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করলেন তিনি—গান লেখালেন নিজের মনের মতন করে এবং সুর দিলেন হৃদয়গ্রাহী। গোপাল অবশ্য নিজে গান লিখতেন না কেননা লেখাপড়া তিনি জানতেন না। অপরকে দিয়েই লেখাতেন কিন্তু একটা স্বাভাবিক রসবোধ তাঁর এমন এসে গিয়েছিল যে লেখককে তিনি নাটকীয় ভাব বিচার করে নির্দেশ দিতে পারতেন। এইটিই হচ্ছে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালা। এর সব কিছুই তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা। অবশ্য রাধামোহনের পালার গানগুলি কিছু উচ্চাঙ্গের ছিল—গোপাল তাকে হাল্কা করে আনলেন কিন্তু গতানুগতিক ধারা বর্জন করে একটা সজীব নতুন ভঙ্গীর প্রবর্তনও এই সঙ্গে করতে সক্ষম হলেন তিনি। এইখানেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব।

নিজের দল নিয়ে গোপাল যাত্রা চালিয়েছিলেন আরও দশ বছর। যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন তিনি। যতদিন বেঁচে ছিলেন অপর কোন যাত্রার দল তাঁকে হারাতে পারে নি। তবে বাঁচেন নি বেশিদিন। তাঁর প্রভুর মত তিনিও ছিলেন স্বল্পায়ু। চল্লিশের কোঠায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।)

গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সাহিত্যের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকরই বলতে হবে। স্থানে স্থানে রুচির প্রশংসাও করা যায় না। তেমন উৎকৃষ্ট পরিমার্জনা এই ধরনের একজন অভিনেতার কাছ থেকে আশাও করা যায় না, তবে ওরই মধ্যে দু-একটি গান মন্দ উতরোয় নি রচনার দিক থেকে। কিছু উদ্ধৃত করা যাক—

ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার চার দিকে মালঞ্চ বেড়া
ভ্রমরেতে গুন গুন করে কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া।
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে
আনন্দিত কুসুম বনে
আমার এই ফুলবাগানে তিলেক নাই বসন্ত ছাড়া।

যাবনা যাবনা মালঞ্চে।
এমন করে দুসন্ধ্যে কি প্রাণ বাঁচে।
যাব সেই বকুলতলা
কুড়িয়ে ফুল আজ গাঁথবো মালা, সাজাব ডালা,
যা বলে বলবে রাজবালা
ভাগ্যেতে মোর যা আছে।
যাব সেই বাঁধা ঘাটে নানাজাতি কুসুম ফোটে
যে পায় সে লোটে
বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না,
মরি মনের আপসোসে।

কি করি উপায় সখি বিহনে সেই গুণমণি
ব্যাকুলা হতেছে মন মণিহারা যেমন ফণী।
কি ক্ষণে সে দেখা দিল মন প্রাণ হরে নিল
এবে কোথা লুকাইল চিত্তচোর চূড়ামণি।
এনে দে সেই চিত্তচোরে রাখি তারে চিত্র করে
চিত্তপুট কারাগারে চোরে দণ্ড দিই এখনি।

(সহজ সরল সুরের দিক থেকে এবং নতুন গীতভঙ্গির দিক থেকেই গোপালের রচনার মূল্য নির্ধারণ করা হয়। বাংলার সঙ্গীতে গোপালের এই প্রভাবটিই চিরস্থায়ী হয়ে আছে। এমন এক সময় ছিল যখন "ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চবেড়া" গানটি লোকের মুখে মুখে ফিরত। এই সুরে এবং এই ঢঙে কত গান যে পরে রচিত হয়েছে বলা যায় না। আজও যাঁরা সুপ্রাচীন হয়েছেন তাঁদের এই গানটি স্মরণ করিয়ে দিলে হয়তো অনেক দিনের পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ে যাবে। বার্ধক্যস্খলিত কণ্ঠে হয়তো ওই লাইনটি একবার গাইতেও চাইবেন তাঁদের অনেকে।)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেও মনে পড়ে। পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরুর জন্মদিন—এর ঠিক তিনদিন আগে অর্থাৎ বাইশে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সাল বাংলা ১২৫৫। বাংলার কাব্যসঙ্গীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দান অতুলনীয় অথচ তাঁকে আমরা ভুলে গেছি বললেও অত্যুক্তি হয় না। যে আকারমাত্রিক স্বরলিপি আজকাল সঙ্গীতে আমরা নিত্য ব্যবহার করি সেই উৎকৃষ্ট এবং সরল পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সঙ্গীত সম্বন্ধে আজ যে এত লেখালেখি, আলোচনা এরও প্রধান প্রেরণা এসেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকেই। অথচ আমাদের সঙ্গীতসমাজেই তিনি আজ বিস্মৃত। আশ্চর্য আত্মবিস্মৃতি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মের বহুপূর্বে একসময় বাংলা গানে একটা জাগরণ এসেছিল যার ফলে কাব্যসঙ্গীতে টপ্পা সুপ্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু সে জাগরণের সঙ্গে সামাজিক চেতনা তেমন করে জাগ্রত হয় নি। ফলে সঙ্গীত যাঁরা অবলম্বন করলেন তাঁদের বাধ্য হয়েই কিছু নিম্ন-রুচির কাব্যসঙ্গীতকে আশ্রয় করতে হ'ল তখনকার দিনের মনোভাব অনুযায়ী। বাংলা সঙ্গীতের গতি আবার নিম্নাভিমুখী হতে লাগল। সময়টা যখন এমনি তখন এল প্রবল সামাজিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে সঙ্গীতে একটা গাম্ভীর্য দেখা দিল এবং একটি শান্ত সংযত ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই সময়ে বাংলাদেশে ধ্রুপদের নব অভ্যুদয় ঘটল যার প্রকাশ হয়েছে বহু ব্রহ্মসঙ্গীতে। ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত ছাড়া অপরাপর কাব্যসঙ্গীতে এই শান্ত সংযত শ্রী ফিরিয়ে আনবার জন্য সচেষ্ট হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সঙ্গীত সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী ছিলেন তিনি; সেই কারণে কাব্যসঙ্গীতের প্রচলিত ধারাকে তিনি পরিত্যাগ করেন নি। সেকালকার সেই

আড়-খেমটা টপ্পাচালের সঙ্গীতধারা তিনি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাকে প্রয়োগ করলেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে সুমার্জিত এবং সুপরিকল্পিত রচনায়। এইখানেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। তিনি স্কচ্ কেদারা বা ইটালীয়ান ঝিঁঝিটে সুর রচনা করেছিলেন এইটাই বড় কথা নয়, তিনি আমাদের সাঙ্গীতিক রুচির যথেষ্ট উন্নয়ন করেছিলেন, প্রাচীন রীতিকে পরিত্যাগ না করেও সঙ্গীতের একটা বিরাট সংস্কার সাধন করেছিলেন—এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। অথচ তিনি যে সঙ্গীতে প্রাচীনপন্থী ছিলেন তা নয়। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে প্রচলিত সুর নিয়ে তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করতেন, এই পরীক্ষা চলত পিয়ানোতে। এর ফলে—"ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত।" এই যে বাংলা গানে নতুন পরীক্ষা এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আগে আর কেউ এমন ভাবে করেছেন কি না সন্দেহ। পিয়ানোতে এইসব পরীক্ষার দরুন আমাদের সঙ্গীতে আবার আর একটা নতুন রূপের আভাস ফুটেছে। এমন কতকগুলি গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আছে পিয়ানোর সঙ্গে সহযোগিতায় যেগুলির একটা বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে। অবশ্য এই সব গানের প্রত্যেকটিই যে তিনি পিয়ানোতে বসে সুর দিয়েছেন এমন কথা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই, কিন্তু পিয়ানোর ঝোঁক যে, এইসব সুরে ফুটে উঠেছে সেটা নিশ্চয় করে বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'রাখ্‌লো সখি রাখ্‌লো বীণা', 'প্রেমের কথা আর বোলো না', 'ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখি', রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'কে যেতেছিস আয়রে হেথা', প্রভৃতি গানের উল্লেখ করা যায়। এই যে সমস্ত পরীক্ষা এর মধ্যে ছন্দ, ভঙ্গি, বৈচিত্র্য নানা দিক দিয়ে একটা নতুন প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রেমের কথা আর বোলো না'—এই ধরনের গানে যেমন ছন্দ এবং সুরের পরীক্ষা করা হয়েছে তেমনি সেকালকার খুব সরল অথচ অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিণত ঢঙের কিছুটা বিলম্বিত লয়ের সুর রচনাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কম করেন নি। 'প্রাণ বড় ব্যাকুল হল,' 'কেনই বা ভুলিব

তোমায়', 'নিতান্ত না রইতে পেরে'—এইসব গানের সুর মীড়ে ছোট ছোট টপ্পার কাজে, ভাবে রসে নিটোল হয়ে আছে। খেমটা ঢঙের গানেও তাঁর হাত ছিল পাকা। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের লেখা 'কে যেতেছিস আয়রে হেথা' গানখানির উল্লেখ করা যায়। সমগ্র বাংলা গানের মধ্যে এই গানটি একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। গানটিতে একটি অপূর্ব নৃত্যভঙ্গি ফুটে উঠেছে। সুরের গতি হাল্কা, ছন্দও হাল্কা কিন্তু তা সত্ত্বেও গানটি খুব হাল্কা নয়, প্রতিটি কথার ভাব সুরে মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং একটি করুণ মধুর বিবশভাব মনকে একেবারে বিহ্বল করে দেয়। পিয়ানোর সহযোগিতায় গানটি জমেও চমৎকার। ছন্দ এবং সুরের দিক থেকে আর একটি মনোহর সৃষ্টি তাঁর নিজের লেখা 'মন চুরি করিল' গানটি। বারোয়াঁ-পিলু সুরে ঝাঁপতালে এটি একটি নতুন ভঙ্গির প্রবর্তন করেছে। বৈচিত্র্যের দিক থেকে তাঁর আর একটি গান লক্ষণীয়।—

"মধ্যাহ্ন বেলা
ঝাঁ ঝাঁ করে দিকদশ
বায়স ডাকে নিরালা।
খরতর তাপে জরজর ধরণী
উদাস আকাশে হুতাশ জ্বালা।"

এটির সুর মধুমাধবী সারঙ্গ, তাল—ঢিমে তেতালা। সুরটিতে মধ্যাহ্ন বেলার একটা করুণ শুষ্ক মূর্তি তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। এইসব গানে ছন্দের প্রাধান্য তেমন নেই, এগুলির বৈশিষ্ট্য ঢালা সুরের কাজে।

সঙ্গীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন গীতনাট্য রচয়িতা, প্রযোজক, সুরকার, পিয়ানো, হারমোনিয়াম, সেতার, বেহালা প্রভৃতি বহু যন্ত্রের অভিজ্ঞ বাদক। এতগুলি বিষয় আয়ত্তে থাকা বড় কম কথা নয়।

প্রথম যৌবনে তাঁর অধিকাংশ সময় কাটতো খুল্লতাতপুত্র গুণেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায়—গানবাজনায় গল্পগুজবে। সত্যেন্দ্রনাথ

বিলাত থেকে ফিরে এসে যখন বোম্বাই-এ ছিলেন তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে নানা ভাষায় বিস্তর পড়াশোনা করতেন আর করতেন সঙ্গীত চর্চা সেতার হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাজনার সঙ্গে। কলকাতায় এসে তিনি নাটকের দিকে মনোনিবেশ করলেন। এই সময় তাঁদের বাড়িতে যেমন সাহিত্যচর্চা হ'ত তেমনি হ'ত সঙ্গীতচর্চা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানের আসরে নানারকম পরীক্ষা হ'ত অক্ষয় চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ এঁদের নিয়ে। পিয়ানোতে নতুন নতুন গানের সুর দিতেন তিনি আর কথা বসাতেন প্রধানত অক্ষয়চন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ। পুরোনো গানের ভাণ্ডার ছিল অক্ষয়চন্দ্রের কাছে। সেইসব গানের নানারকম ঢং তিনি আমদানী করতেন এবং প্রাচীন গানের সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় হ'ত এই আসরে। ১৮৭৭ সালে যখন ভারতী পত্রিকা বেরিয়েছে তখন তাঁর সঙ্গীতোদ্যম চলেছে পুরোমাত্রায়।

স্বরলিপি নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাধনা চলেছিল বহুদিন। স্বরলিপির প্রথম প্রচেষ্টা করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু তাকে অনেক সহজ করে আনলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। আদি প্রচেষ্টা থেকে তিনি সংখ্যা-মাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন করেন। এর কয়েক বৎসর পরে উদ্ভাবন করলেন সবচেয়ে সহজবোধ্য আকার-মাত্রিক স্বরলিপি। ১৮৯৭ সালে ডোয়ার্কিনের দোকান থেকে বেরুলো 'স্বরলিপি-গীতি-মালা'—এতে আকার-মাত্রিক স্বরলিপির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এবং তাঁর নিজের, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতির লিখিত বহু গানের স্বরলিপি প্রকাশ করে এই ধারাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

স্বরলিপি-গীতি-মালার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'বীণা-বাদিনী' নামক সঙ্গীতবিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করলেন। এইটিই সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রথম মাসিকপত্র। বীণাবাদিনীতে সঙ্গীতবিষয়ক প্রবন্ধ হিন্দী বাংলা গানের, গতের স্বরলিপি প্রভৃতি প্রকাশিত হ'ত। পত্রিকাটি চলেছিল দু'বছর।

এর পরে তাঁর চেষ্টাতেই স্থাপিত হ'ল ভারত সঙ্গীত সমাজ এবং এর মুখপত্র হ'ল সঙ্গীত প্রকাশিকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন পুণায় ছিলেন তখন সেখানকার 'গায়ন সমাজ' দেখে কলকাতায় এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে ছিল। বীণাবাদিনীর প্রথম সংখ্যায় তিনি একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করেছিলেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল যে, সঙ্গীতের ক্রমশ অবনতির জন্য সঙ্গীত সমাজ নামক একটি সভা করা আবশ্যক যাতে সঙ্গীতের সংরক্ষণ এবং উন্নতিবিধান করা যায়। এই সমাজের অধীনে একটি সঙ্গীতশালা থাকবে এবং সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিগণ প্রতিদিন কিংবা সপ্তাহে একটি সন্ধ্যায় সেখানে সমবেত হয়ে গান-বাজনা বা সঙ্গীত সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করবেন। সভার বেতনভুক একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ও বাদক সঙ্গীতশালায় সর্বদাই উপস্থিত থাকবেন। উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে যিনি যা পারেন, কেউ বা যন্ত্র বাজাবেন, কেউ গান গাইবেন, কেউ সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ পাঠ করবেন, আবার মধ্যে মধ্যে পেশাদার গুণীজনকে আহ্বান করে তাঁর গানবাজনাও শোনা যাবে। কখনো কখনো উৎকৃষ্ট যাত্রা, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করে সভ্যগণের চিত্তবিনোদন করা হবে। প্রতি বৎসর সভার সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে বা সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে দেশবিদেশ থেকে গুণীগণকে আহ্বান করে সঙ্গীত উৎসবের অনুষ্ঠান এবং তাঁদের পারিতোষিক দেওয়া হবে।

এইরকম উন্নত পরিকল্পনাও বোধ হয় আমাদের দেশে এই প্রথম। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও হয়েছিল কিছুদিন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারত সঙ্গীত সমাজ অল্পকালের মধ্যেই স্থাপিত হ'ল। প্রথমে এই সমাজ কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে বসত। সকল শ্রেণীর সম্মিলিত উদ্যমে কাজও বেশ চলতে লাগল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মতদ্বৈধ দেখা দিল এবং সমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তারপরে সচরাচর যা ঘটে তাই ঘটল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন ভারত সঙ্গীত সমাজের প্রথম সম্পাদক এবং পরে অন্যতম সভাপতিও নির্বাচিত

হয়েছিলেন। প্রথমদিকে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁকে পরিশ্রম বড় কম করতে হয় নি, গানবাজনার ব্যবস্থা ছাড়াও তাঁর বহু নাটকের অভিনয়ও সমাজে বহুবার হয়েছিল।

সঙ্গীত প্রকাশিকা বেরিয়েছিল ১৯০১ সালে। এই পত্রিকায় প্রাচীন শাস্ত্রাদির প্রকাশ, শাস্ত্রোল্লিখিত পারিভাষিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা এবং প্রচীন রচয়িতাদের সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রভৃতি প্রকাশ করা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া সে সময়কার রচয়িতাদের গান তো আছেই। এই উদ্দেশ্য তিনি অনেকাংশে সফলও করতে পেরেছিলেন। এমন উন্নত ধরনের সঙ্গীত পত্রিকা এ যুগেও আর বেরোয় নি।

কাব্যসঙ্গীতের আর একটা দিক অর্থাৎ সউচ্চাঙ্গ ঙ্গীতের দিকেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দান বড় কম নয়। বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছেন তিনি, বৈচিত্র্যের দিক থেকে সেগুলি অতুলনীয়। বাংলায় উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদভঙ্গিম কাব্যসঙ্গীতের স্রষ্টাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের স্থান যে সর্বোচ্চে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

সঙ্গীতে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ছিল কিন্তু শুধু সঙ্গীতেই নয়, অপরাপর বহু বিষয়েই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যের বহু বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (যার অন্যতম সভাপতি ছিলেন তিনি এক বছর) স্থাপিত হবার পূর্বেই তিনি সারস্বত সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন একই উদ্দেশ্যে। সংস্কৃত এবং ফরাসী ভাষা থেকে বহু অনুবাদও তিনি প্রকাশিত করেছেন। এর সঙ্গে আবার নানা ব্যবসায়েও হাত দিয়েছিলেন। এতগুলি বিষয়ে মনোনিবেশ করার ফলে তাঁর ভাবনা চিন্তা ছিল প্রচুর। শোক, দুঃখ, আঘাতও কম পান নি কিন্তু ধীরভাবে সবই সহ্য করেছেন এবং প্রত্যেকটি কর্তব্য একের পর এক সম্পাদন করে গেছেন। স্বরলিপির ব্যাপারেও তাঁকে কম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় নি। গীতসূত্রসার রচয়িতা কৃষ্ণধনবাবু তাঁকে তীব্র ভাষায় অসঙ্গতভাবে আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু তিনি

প্রত্যুত্তরে কোনরকম অসহিষ্ণু মনোভাব প্রকাশ করেন নি। ব্যবসায়ে বহু ক্ষতি তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল কিন্তু সে সব স্বীকার ক'রে নিয়েও মনোভাব লাঘব করেছিলেন তিনি চিত্রাঙ্কনে, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের সেবায়। শেষ বয়সে তিনি যখন রাঁচিতে ছিলেন তখনও সঙ্গীত তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কোন কোন ব্যক্তিকে তিনি এই বয়সে নিজের স্মৃতি থেকে আগাগোড়া "বাল্মীকি প্রতিভা" গেয়ে শুনিয়েছেন।

১৯২৫ সালে ৪ঠা মার্চ (বাংলা ১৩৩১এর ২০শে ফাল্গুন) রাঁচিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গীত সাহিত্যে লেখালেখি খুব কমই হয়েছে অথচ তাঁর রচনার গভীরত্ব অল্প নয়। একজন সঙ্গীত রচয়িতা বললেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিচয় দেওয়া হ'ল না। যে সব সঙ্গীত রচয়িতা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উদিত হয়েছেন তাঁদের মূলে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—কাব্যসঙ্গীতের নব-অভ্যুদয়ের পন্থা তিনিই নির্ণয় করেছিলেন। রচনা এবং সুরর নূতনত্বের ইঙ্গিতও তাঁর কাছ থেকেই এসেছিল। শুধু তাই নয়, তাদের সংরক্ষণের পন্থাও তিনি আবিষ্কার ক'রে গেছেন, কিন্তু এই প্রচারবিমুখ নিরহঙ্কার আত্মগোপনপ্রয়াসী ব্যক্তিটি সকলের জন্য পরিশ্রম করেছেন, নিজে থেকেছেন আড়ালে। এর জন্য তাঁর কোন ক্ষোভ ছিল না।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যসঙ্গীত

সেকালকার পাঁচালী গানকে উল্লেখ ক'রে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন "এই পাঁচালী এত অভদ্রতা ও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অসঙ্গত অনুপ্রাস ও উপমার এত ছড়াছড়ি থাকিত যে, এখন আমাদের আশ্চর্য বোধ হয় কিরূপে লোকে তাহাতে প্রীত হইত। কিন্তু তখন লোকে পাঁচালী গান শুনিবার জন্য পাগল হইত।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ)

কেন যে লোকে পাগল হ'ত, শাস্ত্রী মহাশয় তা বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। তাঁর চোখে দাশরথি রায়ের পাঁচালীর অভদ্রতা, অশ্লীলতা, অসঙ্গত অনুপ্রাস এই সবই পড়েছে, পড়েনি কেবল আর একটি দিক যা লোককে এই সব অনুষ্ঠানে আকর্ষণ করত। এই দাশরথি রায়ই গান বেঁধেছিলেন—

"ননদিনী বোলো নগরে সবারে
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্কসাগরে।"

অথবা

"ওগো সজনী রাই অঙ্গ সাজাব দিয়ে কি ভূষণ
ও যার রূপে রইল ঢাকা রাকাশশীর কিরণ"

আর, লোকে পাঁচালীর এসব গান শুনতেই ছুটে আসতো। শুনতো, শুনে চোখ মুছতো, অশ্লীলতার কোন প্রশ্নই হয়তো উঠতো না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর যাঁরা উচ্চশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন, তাঁরা অসাধারণ এবং এই অসাধারণ দৃষ্টিতে তাঁরা সাধারণ্যে প্রচলিত গানের মধ্যে কেবল অশ্লীল আর ইতর জিনিস ছাড়া কিছুই দেখলেন না। এই শিক্ষাভিমানী দৃষ্টি ভালোকে দেখেছে, মন্দকে দেখেছে,—দেখে নি শিল্পের সেই দিকটিকে যা ভালোমন্দ থেকে আলাদা। এই বিংশ

শতাব্দীতে সেই দৃষ্টির ভুল ধরা পড়েছে। সেদিন এক সাংস্কৃতিক আসরে দেখলাম, কবেকার সেই "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রার বহু নিন্দিত গান "নাগর কে তুমি বিদেশী" হাততালি দিয়ে শুনছেন উচ্চশিক্ষিত শোতৃ-বৃন্দ। কী তাঁদের আকর্ষণ করেছে? বোধ হয় সেই আকর্ষণ যা দাশরথির যুগে ছিল। কিন্তু হায়, সে রামও নেই অযোধ্যাও নেই, শুধু ছেঁড়া রামায়ণটাই পড়ে আছে, তার অনেক পাতা নেই, সেসব অংশ আজ আমরা অনুমান দিয়েই ভরিয়ে দিচ্ছি।

উনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারা ভারি আশ্চর্য। এ যুগে এত তর্ক বিতর্ক সূক্ষ্ম বিচার হয়েছে, কিন্তু ফলে হ'ল কি? জীবনধারায় একটা কৃত্রিমতা এসে গেল। খুব একটা সাজানো গোছানো ব্যাপার যেন সমাজের উন্নত শ্রেণীকে কেমন আলাদা করে রাখল। কথাবার্তা, চালচলন, গানবাজনা সবেতেই একটা নির্দিষ্ট ফরমুলা কাজ করেছে। সাধারণ আর পাঁচজন থেকে সযত্নে গা বাঁচিয়ে চলাটাই যেন ছিল সুস্থ জীবনের লক্ষ্য। সঙ্গীতও যখন এই মাপে গড়ে উঠতে লাগল, তখন সঙ্গীত দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল, একটি পুরাতন ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলল আর অপরটি নতুন সংস্কৃতির নিয়মকে অনুসরণ করে সংগঠিত হ'ল। স্বভাবতঃই শিক্ষিত সমাজ যাকে প্রাধান্য দিলেন, তারই প্রচার হ'ল আর প্রচলিত গান অবহেলায় অবহেলিতদের মধ্যেই পড়ে রইল। কিন্তু এইখানে একটু মজার ব্যাপার আছে। এই প্রচলিত সঙ্গীতের মধ্যেই তো আসল জিনিস ছিল। এই অভদ্র, ইতর গানগুলিতো সুরের দিক থেকে দরিদ্র ছিল না। সুতরাং কৃতবিদ্য সমাজ একটি চমৎকার কাজ করলেন (এঁরা অবশ্য নানা ক্ষেত্রেই এখনও এই অভ্যাসটি বজায় রেখেছেন) অর্থাৎ সেই সব গানের সুর এবং সৌষ্ঠব নিজেদের গানে এনে বসিয়ে দিলেন এবং ঘুণাক্ষরেও একথা প্রকাশ করলেন না। ফলে তাঁদের রচনার জয়-জয়কার হ'ল এবং আমাদের আগেকার গানের 'শক হুন দল পাঠান মোগল' এই সব নবীন সঙ্গীতের দেহে লীন হয়ে গেল। অনেক ভাল ভাল উচ্চাঙ্গ

কাব্য-সঙ্গীত ব্যবচ্ছেদ করলে বেরিয়ে যাবে সেই নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, দাশরথি রায়, রাম বসু, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি, কিন্তু এই ব্যবচ্ছেদটি এখনও হয় নি।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ছিলেন এইরকম একজন সঙ্গীত রচয়িতা, যিনি সেকালের ধারাকেই অবলম্বন করে গান লিখে গেছেন এবং শিক্ষাভিমানীদের অবহেলাও মাথা পেতে নিয়েছেন। তারপর যখন সাধারণ্যে তাঁর খ্যাতি অতি বিস্তৃত হ'ল, তখন তিনি সাহিত্যিক স্বীকৃতি পেলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধে সত্যিকারের আলোচনা বা তার মূল্য নির্ধারণ আজও হয় নি। বলতে গেলে সেযুগের নাট্য-সঙ্গীতের দিকে আমরা তেমন নজর দিই নি, বাজে খেলো জিনিস বলে ফেলে রেখেছি; কিন্তু এই নাট্যসঙ্গীতের মূল্য নেহাং কম নয়। যাত্রা বা নাটকের গান যে শুধু অভিনয়ের আসরটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন তো নয়, লোকের মুখে মুখে বিস্তৃত হ'য়ে জীবনধারার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। বহুদিক থেকে তার আবেদন ছিল। গিরিশচন্দ্রের বহু গান নাটকীয় পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ বাঙ্গালীর মনকে আকৃষ্ট করেছিল, যার ফলে সৌখিন আসর থেকে ভিখারির কণ্ঠে পর্যন্ত গিরিশ ঘোষের গান শোনা যেত। গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি সাধারণ বাঙ্গালীর মনকে দখল করতে পেরেছিলেন তাঁর সহজ সরল অথচ বহু বিচিত্র রচনায়।

গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে আর একটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, প্রত্যক্ষভাবে নিজে সুর না দিয়েও তিনি বহু বৈচিত্র্য প্রয়োগের অবকাশ রেখে গান রচনা করেছিলেন। গান বাজনা তিনি ভাল বুঝতেন এবং তাঁর প্রেরণাতেই সাধারণ রঙ্গালয়ে নাট্যসঙ্গীত গড়ে উঠেছিল। এই নাট্যসঙ্গীতে হাল্কা চটুল গান থেকে ভাবঘন ভক্তিমূলক সব গানই ছিল। গিরিশচন্দ্রের গানে যাঁরা সুর দিয়েছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'গিরিশ গীতাবলী'তে যাঁদের নাম আছে তাঁরা হচ্ছেন—রামতারণ সান্যাল, দেবকণ্ঠ বাগচি, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল দত্ত

(হাবুবাবু), সুরেন্দ্রনাথ দত্ত (তমুবাবু), নরেন্দ্রনাথ সরকার, জিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। এর মধ্যে গিরিশচন্দ্রের গানের সুরকে রক্ষা করবার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেবকণ্ঠ বাগচির প্রাপ্য। তিনিই সবচেয়ে বেশি স্বরলিপি করে রেখে গেছেন। সঙ্গীতাচার্য দেবকণ্ঠ বাগচি মিনার্ভা এবং ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের প্রায় যাবতীয় নাট্য সঙ্গীতের সুর সংযোজনা করেছিলেন। এছাড়া গিরিশচন্দ্রের আরো বহু গানের সুর তাঁর জানা ছিল। সে সব গানের সুরতাল অন্তত তিনি উল্লেখ ক'রে গেছেন। অনেক গানের স্বরলিপিও সেকালকার বহু গ্রন্থে এবং পত্রিকায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

গিরিশচন্দ্র নাটকে প্রয়োগশিল্পের দিকে যেমন নজর দিয়েছিলেন, সেরকম নাট্যসঙ্গীতেও একটা বাস্তব মানবিক আবেদনের পক্ষপাতী ছিলেন। সুরকারগণ এই নির্দেশেই তাঁর গানে সুর প্রয়োগ করেছেন। বাংলা গান অবশ্য বরাবরই কিছুটা নাট্যধর্মী, এইটিই বাংলা গানের চিরকালের বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চ সমাজের ভাববিলাসী সম্প্রদায় আমাদের গানকে খানিকটা subjective করে তুলেছিলেন, যার ফলে আজও আমাদের কাব্যসঙ্গীত কিছুটা কৃত্রিম রয়ে গেছে, কিন্তু বাংলা গানের প্রচলিত ধারা বরাবর সাধারণ মানবিক অনুভূতিরই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। বাংলা গানের ইতিহাস আলোচনা করলে এটা লক্ষ্য করা যায় যে, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ভাব অথবা রাগালাপ আর তাল মান নিয়ে বাঙালী কোনদিন সন্তুষ্ট ছিলেন না অথচ রাগসঙ্গীতের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়াটাও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। রাগসঙ্গীতকে তাঁরা নিজেদের মত ক'রে জীবনধারা এবং ভাবধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে গঠন করেছিলেন। অতএব সে সঙ্গীতে ভাবালুতা এবং বাস্তবতার একটা সমন্বয় হয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে আমাদের বাংলা গানে টপ্পা, পাঁচালী, কথকতা, শ্যামাসঙ্গীত, উমাসঙ্গীত প্রভৃতি বিবিধ সঙ্গীতে রাগসঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যসঙ্গীতের প্রসাদগুণ প্রচুর পরিমাণে ছিল। বস্তুত এই প্রচেষ্টায় যে সঙ্গীত

গড়ে উঠেছিল তার একটা বিশিষ্ট নাট্যরূপ ছিল। গিরিশচন্দ্র এই রীতিতেই তাঁর গানে সুর রচনার প্রেরণা প্রদান করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ সেকালের দাদরা-খেমটা রীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই রীতিগুলির একটি বিশেষ আবেদন আছে। মনের কতকগুলি সূক্ষ্ম অনুভূতিকে রূপ দেবার পক্ষে এই সব ঢং বিশেষ উপযোগী। এই কারণেই আড়-খেমটার চালটি সেকালকার যাত্রাগানে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হ'ত। গিরিচন্দ্রের এই রকম বহু গানের মধ্যে "বিল্বমঙ্গল" নাটকের "যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী" গানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—

যাই গো ঐ বাজায় বাঁশি প্রাণ কেমন করে
কালা একলা এসে কদম তলায় দাঁড়িয়েছে আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায় তত পথপানে চায়
পাগল বাঁশি ডাকে উভরায়
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মানভরে॥

এ গানটি হয়তো অন্য ঢঙে গাওয়া যেতে পারত কিন্তু এই অবর্ণনীয় প্রাণ-কেমন-করার অনুভূতিটি এই ঢঙে যেমন প্রকাশ পেয়েছে অন্য কোন ঢঙে হয়তো তা সম্ভব হ'ত না। "না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মান ভরে"—এই কথায় যে আকুলতা এও আর কোন ঢঙে প্রকাশ পেত কিনা সন্দেহ। এই কারণেই এইসব গান সাধারণত এত প্রিয়। এ সুর—এ ঢঙ একেবারে আন্তরিক। অপরদিকে এই আড়-খেমটাতেই গিরিশচন্দ্রের আর একটি গানে আনন্দের হিল্লোল উঠেছে। গানটি "পারস্য প্রসূন" নাটকের অন্তর্গত—

দেখি আজ নতুন দুনিয়া
নতুন তানে নতুন প্রাণে গেয়ে যায় হাওয়া
নতুন শশী উঠেছে শশী ঘেরে নতুন নতুন তারা ফুটেছে
নতুন ফুলে আজকে নতুন সৌরভ ছুটেছে
প্রাণ মন নতুন-জীবন পেয়েছি নতুন হিয়া
উথলে উঠে নতুন রসের দরিয়া।

পরজ বসন্ত রাগে নৃত্যছন্দে রচিত এ গানটি প্রাণে পুলকের শিহরণ তোলে। আবার এই ঢঙে ভক্তিমূলক ভাবও ফোটানো হয়েছে। এর সুবিখ্যাত উদাহরণ—

রাঙা জবা কে দিলে তোর পায়ে মুটো মুটো
দেনা মা সাধ হয়েছে
পরিয়ে দেনা মাথায় ছুটো
মা বলে ডাকব তোরে
হাততালি দে নাচব ঘুরে
দেখে মা নাচবি কত
আবার বেঁধে দিবি ঝুটো।

দাদরার একটি রকমফের হচ্ছে ২।৪ ছন্দ অর্থাৎ এতে তিন মাত্রা হিসাবে তাল ভাগ না করে তুই মাত্রা এবং চার মাত্রা হিসাবে ভাগ করা হয়। এই ছন্দেরও একটি নাটকীয় আবেদন আছে। গিরিশচন্দ্রের "সীতার বনবাস" নাটকে এই ধরনের একটি চমৎকার গান আছে—"ডাকে পাখিগুলি চল ফুল তুলি"। এরকম ছন্দের বিবিধ বৈচিত্র্য গিরিশচন্দ্রের গানে প্রয়োগ করা হয়েছে, যথা—আড়াঠেকা, যৎ, একতালা, ত্রিতাল, কাহারবা, পোস্তা, পটতাল, খামসা, ধামার, তেওরা, মধ্যমান প্রভৃতি। সুরের দিক থেকেও গিরিশচন্দ্রের গানে কম বৈশিষ্ট্য নেই। এক খাম্বাজেরই সতেরো আঠারো মিশ্ররূপ আছে—এই রকম আরও বহুতর মূল এবং মিশ্ররাগরূপ বর্তমান, এর মধ্যে অনেক কূটরাগও আছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে এলো। অনেকের কাছে শুনেছি বাংলা গানের রাগরূপের তেমন বৈচিত্র্য নেই। এটি অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনবিংশ শতক পর্য্যন্ত বাংলা গানের সমস্ত সুরের যদি তালিকা প্রস্তুত করা যায় তাহ'লে আমাদের বিশ্বাস, আজকালকার কনফারেন্সের কূটরাগ-বিশারদ শিল্পীরাও বিস্ফারিত লোচনে সেই তালিকা নিরীক্ষণ করবেন এবং বহু সুরের পরিচয় জানবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠবেন।

যাক, সেকালের টপ্পার বিচিত্র নিদর্শনও গিরিশচন্দ্রের গানে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। এই ধরনের গানের স্বরলিপি কমই পাওয়া যায়, কেননা টপ্পার রস স্বরলিপিতে ফোটান শক্ত। তথাপি যে দু-একটির সুর পাওয়া যায় তার থেকে নাটকীয় পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে টপ্পার ঢঙ ফোটাবার প্রশংসনীয় পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এই ধরনের একটি গান উদ্ধৃত করি।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ

প্রেমে সই মানা কি মানে।
যেখানে মন টানে তার সে তো তা জানে॥
রূপে সই মন মজে না যে বলে সে মন বোঝে না
ভাসতে সদা রূপ সাগরে মনের বাসনা
খেলে প্রেম রূপ লহরে, রূপের টানে প্রাণ টানে॥

(পারস্য প্রসূন)

স্বরলিপি থেকে এটি বেশ বোঝা যায় যে, টপ্পার পূর্ণ প্রকাশ এসব গানে যাতে না ঘটে অথচ যাতে তার আবেদন থাকে সে বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে।

গিরিশচন্দ্রের গানে প্রযুক্ত এইসব নানা রীতির একটা খুব বড় প্রভাব আমাদের অন্যান্য গানে পড়েছে এবং সেটা কেবলমাত্র অপরাপর নাটকের গানেই নয়, সাধারণভাবেই আমাদের সঙ্গীতের ওপর পড়েছে। সেকালের ওস্তাদরাও গিরিশচন্দ্রের গান গাইতেন এবং নাটকের জন্য যেটুকু বাঁচিয়ে সুর দেওয়া হয়েছিল তাঁদের গানে তাঁরা সেটুকু ঢেলে দিতেন। এই ভাবে গিরিশচন্দ্রের বহু গান রীতিমতো ওস্তাদি সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল। অতএব রঙ্গালয়ের সুরকারগণ যথেষ্ট চিন্তা করে সুর সংযোগ করতেন এটা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। আবার সেযুগে রাগসঙ্গীত থেকে বিচ্যুতি লোকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না—সেটুকুও তাঁদের বিবেচনা করতে হ'ত

এবং এটাও ভেবে দেখতে হ'ত, সুরপ্রয়োগে অনুভূতির প্রকাশ যথাযথ হচ্ছে কি না। আমরা সেযুগের কয়েকটি হাল্‌কা চটুল গান শুনে নাট্যসঙ্গীত সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করি, কিন্তু নাট্যসঙ্গীতের প্রকৃত হিসেব-নিকেশ করলে এবং সাঙ্গীতিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে আমাদের এই মনোভাবের পরিবর্তন হবে।

গিরিশচন্দ্রের একটি বিশেষ সৃষ্টি ভক্তিমূলক সঙ্গীত। এই ভক্তি-মূলক সঙ্গীত কিন্তু ঘোরতর রকমের আধ্যাত্মিক নয় যদিও তাতে একটা ভজনের আমেজ আছে, যেমন "কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকানন-চারী"-জাতীয় গানে। এইসব সঙ্গীতে গিরিশচন্দ্র চমৎকার চিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং আজও এসব গান হিন্দী ভজনের সঙ্গেই গাওয়া চলে। উদাহরণস্বরূপ একটি গান উদ্ধৃত করছি। গানটিতে কৃষ্ণ এবং শিবের দুটি চিত্র পাশাপাশি ফুটে উঠেছে এবং সুরগৌরবে এ চিত্র দুটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

দেশ মিশ্র—ঠুংরী

যোগী। বনফুলভূষণ শ্যাম মুরলীধর
গোপিনীরঞ্জন বিপিনবিহারী।
প্রমথ। বিভূতিছাদন বিষাণবাদন
ঈশান ভীষণ শ্মশানচারী॥
যোগী। দুকূলচোরা রাসরসিকবর
প্রমথ। উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জটী স্মরহর
যোগী। রুণ্ রুণ্ ঝুণ্ ঝুণ্ মঞ্জির গুঞ্জন,
প্রমথ। ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব নর্তন
যোগী। মানোন্মাদিনী রঙ্গিণী
গোপিনীমোহন মানভিখারী—
প্রমথ। মৃড় চন্দ্রচূড় হাড় মাল গল
জটা-তরঙ্গিত জাহ্নবীবারি॥

(জনা)

রাগ সঙ্গীতের সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য এতে আছে। যাঁরা আক্ষেপ করেন বাংলায় হিন্দি ভজনের সমতুল্য গান নেই তাঁরা এইসব গানের সুর পেলে পুলকিত হবেন। ভৈরবীতে আর একটি উৎকৃষ্ট ভজনও উদ্ধৃত করছি। কত সুন্দর বিস্তারের অবকাশ যে এসব গানে আছে তা লিখে বোঝাবার নয়।

ভৈরবী—ঠুংরী

মৃড় চন্দ্রচূড় হর ভোলা
ভূতনাথ বব ব্যোম বব ব্যোম বব
বিনাদ ভৈরব অম্বু উথলা ॥
মনমথশাসন নয়ন হুতাশন
ফণমালগল দল দল দোলা
তমালনিন্দিত কণ্ঠে হলাহল
জলদজাল জিনি জটাজুট দল
কলকল ঢলঢল গঙ্গাবিলোলা ॥

(পূর্ণচন্দ্র)

কিছুকাল পূর্বে নজরুল এইরকম কয়েকটি ভজন রচনা করেছিলেন। তারও পূর্বে কিছু রচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

এগুলি সব নাটকেরই গান কিন্তু সাঙ্গীতিক দিক থেকে বিচার করলে এরা কেবল নাট্যসঙ্গীত হিসাবেই পরিগণিত হবে না, শ্রেষ্ঠ বাংলা গান হিসাবেই পরিগণিত হবে। দুঃখের বিষয়, এসব গানের সুর যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁরা বিস্মৃত হয়েই আছেন। নাট্যসঙ্গীতকে আমরা ওপর ওপর দেখে বিচার করেছি, কেবলমাত্র নীতির মানদণ্ডে পরিমাপ করেছি কিন্তু শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে দেখি নি। তাই নানা গণ্ডি টেনেছি—অনেক বর্জন করেছি। কিন্তু নিজেদের শিক্ষা আর শুচিতা অক্ষুণ্ণ রেখেই বা পেলাম কি? হিসেব করলে দেখা যাবে, পাওয়ার

চেয়ে হারানোর অঙ্ক বেশি। আজ বোধ হয় সেই ভুল ভাঙছে, আবার নতুন করে দেখছি যাদের ফেলে এসেছি তাদের দিকে। আজকের যুগের মুক্ত-দৃষ্টি শিল্পীরা যদি এইসব গান যাতে প্রকৃত মানবিক আবেদন ফুটে উঠেছে, যা কৃত্রিম নয়, তার সন্ধান করে লুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন তবেই আমাদের ঐতিহ্য গৌরবান্বিত হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্র-স্মৃতি সমুজ্জ্বল পুণ্য নববর্ষ। কবিগুরুর স্মৃতিচারণ উপলক্ষ্যে স্বতঃই মনে হচ্ছে সেদিনের কথা যখন তাঁকে আমরা তাঁরই সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রেরণা দিতে দেখেছি। সেই শুভ্র সুন্দর জ্যোতির্ময় দেহ—সেই অপূর্ব সুললিত কণ্ঠস্বর। লোকোত্তর প্রতিভার সঙ্গে অলোকসামান্য সৌন্দর্যের এমন সুঠাম সামঞ্জস্য সমগ্র জগতে দুর্লভ। এই সামঞ্জস্যবিধান বিধাতা ঘটিয়েছিলেন আমাদেরই দেশে। রবীন্দ্রনাথকে লাভ করা সমগ্র জাতির যে কত বড় সৌভাগ্য ছিল, আজ তাঁর তিরোধানের পরে আমরা তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি।

এই যে সৌন্দর্য, যা তাঁর প্রতি সত্তায় অনুভূত হ'ত তাকে তিনি অতি যত্নে চিরস্থায়ী করে রেখে গেছেন তাঁর গানে। তাই যখনই রবীন্দ্রনাথের গান শুনি, তখনই তাঁর সেই অনুপম ব্যক্তিত্ব আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। কবিগুরুর সান্নিধ্য আমরা লাভ করি তাঁর গানের মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মূল কথা এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সৌন্দর্য। তাঁর জীবনের স্তরে স্তরে এই সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে পরিণত কালে পূর্ণ শতদলে বিকাশ লাভ করেছিল। তাঁর রচনায় স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ—প্রতিটি কলিতে সৌন্দর্যের বিভিন্ন বিকাশ সমগ্র গানটিতে একীভূত হয়ে যে বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে, বাংলা গানে তার আর তুলনা নেই। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চারী' এক অতুলনীয় সৃষ্টি। সঞ্চারীর প্রকৃত রূপটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতে যেমন প্রস্ফুটিত হয়েছে, এমন আর খুব কম গানেই হয়েছে।

"সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইশারাতে—
দখিন হাওয়া দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে।"

বসন্তের একটি গানের সঞ্চারী এটি। যাঁরা এ-গানটি জানেন বা শুনেছেন, তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন, অন্তরা এবং আভোগের মধ্যে স্থরের এই সঞ্চরণটুকু কত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং মনোরম। স্থরের একটা বিচিত্র ঝলকে যেন সব কুঁড়ি ফুটে উঠল আর দিশাহারা দখিন হাওয়ায় মাতন লেগে গেল। এমন এক-আধটা গানে নয়—প্রায় প্রতিটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঞ্চারীতে এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের বাংলা গানে যথার্থ সৌন্দর্য সম্পাদনকারীর অভাব বলেই সঞ্চারীর বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রসঙ্গীত ভিন্ন খুব কম রচয়িতার গানেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রযুগের পূর্ববর্তী টপ্পার যুগে সঞ্চারীর প্রয়োজনীয়তা ছিল না—অন্তরার তীক্ষ্ণ আবেগেই তার পরিসমাপ্তি হ'ত এবং তাতেই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। স্থতরাং টপ্পার দিক থেকে এ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ নেই, কিন্তু অপরাপর কাব্যসঙ্গীত অধিকাংশই অন্তরার বাহুল্য বহন করে এসেছে—পর পর দুটি তিনটি কলি অন্তরার স্থরেই গাওয়া হ'ত। এর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে স্থরকারের প্রতিভার অভাব এবং গতানুগতিক পন্থার অনুসরণ। রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক পন্থা কোনদিনই অনুসরণ করেন নি এবং তাঁর অন্তরে স্থরের এত অগাধ বৈচিত্র্য ছিল যে, কোনদিন তার প্রয়োজনও হয় নি। অতি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে তিনি আমাদের সঙ্গীতে সৌন্দর্য সম্পাদন করেছেন।

আজকাল রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। কেউ কেউ তাঁর গানে গায়কের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এই অভিযোগ করেন, কেউ বা তাঁর পুরোনো গানগুলিই আদর্শ বলে মনে করেন এবং পরবর্তী গানগুলির স্বীকৃতি দিতে চান না। অনেকে তাঁকে Classicist বলেন, অনেকে বলেন তিনি রক্ষণশীলতায় কেবল ভাঙনই ধরিয়ে দিয়েছেন। এমন বহু মতামত আজকাল প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন পত্রিকায় এবং এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অনেকেই অখণ্ডভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন না। অনেকে আবার

রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বীয় মতবাদের সমর্থন না পেয়ে অনেক যুক্তিহীন বিরুদ্ধ মন্তব্যও করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত প্রাতভা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গেলে অনেক চিন্তার পর করা উচিত, কেননা, কবিগুরু তাঁর দীর্ঘজীবনে স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে তাঁর সৃষ্টিকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছেন। এই যে ক্রমপরিণতি, এটা সময় নিয়েছে—একটি বিরাট প্রতিভাকে এর জন্য ভাবতে হয়েছে বিস্তর—কবিগুরুর এই চিন্তাশীল-তার প্রতি কোন রকম শ্রদ্ধা না রেখে যাঁরা সহসা একটা মন্তব্য করে বসেন, তাঁরা হঠকারিতারই পরিচয় দিয়ে থাকেন।

একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথ অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ; আর প্রতিভার লক্ষণই এই যে, সে প্রথাগত বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করে অথচ তার রচনা প্রথাগত বা Conventional রচনারীতির ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। কবিগুরু বাল্যকাল থেকে সেযুগের বাংলা গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং সে পরিচয় এত গভীর যে, শেষ বয়সেও তিনি এসব গান গেয়ে প্রচুর তৃপ্তিলাভ করতেন। বাংলা টপ্পা তাঁর এত প্রিয় ছিল যে, তার প্রভাব তাঁর গানে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। ধ্রুপদের বৈশিষ্ট্যও তিনি তাঁর গানে সমানভাবে রক্ষা করে গেছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত টপ্পাও নয়, ধ্রুপদও নয়, সে সৃষ্টি একান্তভাবেই তাঁর নিজের—আর এটি যদি না হ'ত, তবে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে পরিচিত হতেন? কেবলমাত্র সঙ্গীত সংস্কারক হিসাবে বা অনুকরণ-দক্ষরূপে? এইটুকুতেই রবীন্দ্র-প্রতিভার সীমা নির্ধারিত হলে আজকের সমালোচক, যাঁরা তাঁর পুরাতন গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাঁরাই হয়তো বলতেন—রবীন্দ্রনাথ এ আর বেশি কি করলেন? এতো সেই পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি। তাই সকলকে অবাক করে রবীন্দ্রনাথ হাত দিলেন তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিতে এবং এই যে সৃষ্টি, এইখানে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করেছেন। এই আধুনিক রবীন্দ্র-সঙ্গীতই প্রকৃত রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে performer বা গায়কের স্বাধীনতা নেই, এমন অভিযোগ যাঁরা করেন, তাঁরা একটা কথা ভুলে যান যে স্রষ্টা যত প্রতিভাশালী হবেন, ততই তাঁর রচনা আত্মকেন্দ্রিক হবে, ততই তাঁর রচনায় তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ এসে পড়বে। স্বাভাবিক নিয়মেই এটা হবে। এর জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করা ভুল। এ যে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত জিনিস, এখানে তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বকে এড়িয়ে অপরজন কিভাবে আর একটি ধারার সংযোগ সাধন করবেন ? এই স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবার জন্য কোন ক্ষোভের কারণ নেই, বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথ যে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে তাঁর সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে প্রস্ফুটিত করতে পেরেছেন, এই সার্থকতাই একটি পরম গৌরবের বস্তু।

কাব্যসঙ্গীত জিনিসটাই ব্যক্তিগত। কাব্যসঙ্গীতে কাব্যর মধ্য দিয়ে আমাদের অনুভূতির প্রকাশ ঘটে এবং এখানে কাব্যটাই মুখ্য। আর এই কাব্যের আরও সুষ্ঠু আন্তরিক রূপ প্রদানের জন্যই তাতে যে সুর প্রয়োগ করা হয়, তা একান্ত ভাবেই স্রষ্টার আবেগ থেকে জন্মলাভ করেছে। অতএব যেক্ষেত্রে কাব্য রচয়িতা এবং সুরদাতা একই ব্যক্তি, সেক্ষেত্রে এই কাব্যসঙ্গীত একান্তভাবে তাঁরই ভাবধারা বহন করতে বাধ্য। এখানে আর একজন স্বাধীনতা চাইলে রসবিকৃতি ঘটা খুবই স্বাভাবিক। এই কারণে রবীন্দ্র-সঙ্গীত যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে, তবে সে স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছে। এর জন্য নালিশ করা ছেলেমানুষি।

প্রতিভার ঈদৃশ আত্মপ্রকাশ শুধু কাব্যসঙ্গীতেই নয়, চিত্রজগতেও ঘটেছে। এখানেও অনুরূপ দৃষ্টান্তই মিলবে। অসামান্য প্রতিভাশালী চিত্রকরগণ সকলেই প্রথাগত চিত্ররচনার ব্যতিক্রম এবং পরিণত বয়সে এঁদের শিল্প একান্তভাবে তাঁদের ব্যক্তিগত রচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাতিস, পিকাশো, ব্রাক—এঁরা সকলেই এমন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছেন যে, তাঁদের পরিণত বয়সের চিত্র একান্তভাবে তাঁদের নিজস্ব

ভাবধারারই প্রতীক। কিন্তু কেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত এতটা আত্মকেন্দ্রিক হলেন, এ নিয়ে অভিযোগ করা নিষ্ফল। ক্যানভাসে সাধারণ পোর্ট্রেট বা ল্যাণ্ডস্কেপ ফুটিয়ে তোলার যুগ তাঁদের জীবনে যেদিন এসেছিল, তা যে স্বাভাবিক নিয়মেই গত হয়ে গেছে। তাঁদের প্রতিভা কি সেই স্তরের যে, এই নিয়েই শেষ পর্যন্ত তাঁরা মেতে থাকবেন? প্রথাগত সৃষ্টি বা কিছুটা সংস্কার সাধনেই যাঁদের উদ্যম নিঃশেষিত হয়, সেই মাঝারি শ্রেণীর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। যতদিন না নিজেকে প্রকাশ করবার বিশিষ্ট পথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন, ততদিন তাঁর প্রতিভা তাঁকে নিশ্চেষ্ট হতে দেয় নি।

শিল্পীকে সুযোগ দেবার মত সঙ্গীত সৃষ্টিও বাংলা গানে হয়েছে, কিন্তু তার জাত আলাদা—যেমন কীর্তন অথবা পুরোনো বাংলা টপ্পা। কীর্তনে কি কাব্যের প্রাধান্য নেই? আছে—কিন্তু সে কাব্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েও শিল্পীর কাব্য প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। তার রচনার ধারাটাই এমনি। তাই কীর্তনে নব নব আখর যোগ করে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে সমধিক মাধুর্যমণ্ডিত করা হয়। বাংলা টপ্পায় আখরের সুযোগ নেই, কিন্তু বোল-তান আছে, বিস্তার আছে, বিচিত্র তান আছে। এই সবগুলো মিলিয়েই গানটা সম্পূর্ণ হয়। অতএব সুরকার এমনভাবে রচনা করেন, যাতে করে গানে সুরের একটি সুন্দর কাঠামো প্রস্তুত হয় এবং বাকীটা এই কাঠামোর ওপর রচনা করেন শিল্পীরা। এক্ষেত্রে যে সুরকার শিল্পীকে যত অধিক সৌন্দর্য সম্পাদনের সুযোগ দিয়ে সুরের অবয়ব তৈরি করবেন, তাঁর গৌরব তত বেশি। এখানে সঙ্গীতের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য শিল্পীর ওপর অনেকখানি দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে। এই কারণেই এসব গান একান্তভাবে ব্যক্তিগত নয়—এমন কতকগুলি অনুভূতির ওপর আশ্রয় করে এই সব গান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা সর্বজনীন। তাই সকলেই স্বীয় ভাবানুযায়ী এই সব গান গাইতে পারেন এবং সঙ্গীতে রস সঞ্চার করতে পারেন।

কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীত এই জিনিস নয়! এখানে শিল্পীকে দিয়ে ভরাট করবার মত কোন ফাঁক কবিগুরু রাখেন নি, কেননা, এ তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। তিনি যতটুকু উপলব্ধি করেছেন, ততটুকুই কাব্যের মধ্যে প্রকাশ করেছেন—আর সুর দিয়ে তাকে পূর্ণ করে রেখেছেন। এখানে তো শিল্পীর কিছু চাহিদা থাকবার কথা নয়, কারণ সব অভাব কবি স্বয়ং মিটিয়ে দিয়েছেন, আর কারো পূর্ণতা সাধনের অপেক্ষা রেখে তিনি গান রচনা করেন নি। তা সত্ত্বেও যদি রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শিল্পী কিছু বৈচিত্র্য সাধন করতে চান, অমনি সেটা কানে ঠেকে—অনাবশ্যক বাহুল্য বলে মনে হয়। সীমা লঙ্ঘনের অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করলে সেটা অসঙ্গত হবে না কোনক্রমেই।

তান বিস্তার দিয়ে কিভাবে গানকে পূর্ণ করতে হয়, তা রবীন্দ্রনাথ ভালভাবেই জানতেন। আমাদের প্রচলিত সঙ্গীতের নিয়ম অনুসরণ করেও তো তিনি কম গান রচনা করেন নি। কিন্তু এই নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, যদি পারতেন তাহলে প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করেই তিনি হয়তো সারা জীবন সঙ্গীত রচনা করে যেতেন। এরও অনেক ঊর্ধ্বে তিনি উঠেছিলেন এবং এই স্তরে এসে তিনি যেসব গান রচনা করেছেন, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন। করাই স্বাভাবিক, কারণ যে স্তরে রবীন্দ্রনাথ উঠেছিলেন সেখানে সাধারণের ওঠা সম্ভব নয়। এখানে তিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন নিজেরই আন্তরিক শক্তিতে, পরের সাহায্যে নয়। অতএব শিল্পী যদি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র অনুভূতিকে অনুভব করতে পারেন, তাহলেই যথেষ্ট—তার অতিরিক্ত তাঁদের কাছ থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করবার কিছু নেই। যে শ্রেণীর গানে শিল্পী সৃজনী-প্রতিভার প্রয়োগ করতে পারেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত তারও ঊর্ধ্বে অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি দ্বারাই এই স্তরে উঠেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল

জন্মদিনে স্মরণের তালিকা থেকে অনেক সঙ্গীত রচয়িতাকে আমরা বাদ দিয়েছি বললে অত্যুক্তি হয় না। তার একটা কারণ এঁদের গান আমরা জানি না, শেখবার অপেক্ষাও রাখি না, অথচ একটা অস্পষ্ট ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক সময় এঁদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করি, যার ফলে এই সব বরেণ্য সুরস্রষ্টা অবহেলিতই থেকে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে এই কথাটি বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণার বশবর্তী হয়ে মন্তব্য করতে শুনেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবদ্দশায় সাহিত্য জগতে যে প্রচণ্ড দলাদলির সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত রচনাকে অবলুপ্ত করবার সেইটাই হয়েছিল সহায়ক। কিন্তু আজ সেই দুই দলের কারুরই অস্তিত্ব নেই। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের সাঙ্গীতিক রচনাকে ভাল করে জানবার এবং বোঝবার সময় এসেছে।

আধুনিক সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিজেন্দ্রলালকে বিচার করবার আগে এটা স্পষ্টই মনে রাখা দরকার যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে আজ থেকে একচল্লিশ বৎসর পূর্বে। ধরতে গেলে তাঁর সঙ্গীতের রচনাকাল সেই সময়ে, যখন বাংলা গানের একটা নবযুগের সূচনা সবে দেখা গেছে মাত্র এবং সেযুগের তুলনায় তিনি কতটা আধুনিক ছিলেন সেটাও আগে বিচার করা দরকার। তখনকার দিনে সঙ্গীতের চিরাচরিত রীতি লঙ্ঘন করাটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। যাঁরা নতুন পথে অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা বাধা পেয়েছেন বিস্তর, প্রাচীনপন্থীদের বিদ্রূপ তাঁদের ওপর অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালকেও এই সবই সহ্য করতে হয়েছিল। সামাজিক জীবনে তিনি একঘরে হয়েছিলেন আবার সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাঁকে একঘরে করবার চেষ্টা হয়েছিল তাঁর ইউরোপীয় রীতি অবলম্বন করবার দরুন। কিন্তু এই

রীতির মিশ্রণে তিনি এতই অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণটা তেমনভাবে সমর্থিত হতে পারে নি। এই রীতি ছাড়াও রাগমিশ্রণে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল আর ছিল গায়নপদ্ধতিতে নমনীয়তার সঙ্গে দৃঢ়তার একটা সহজ এবং সুন্দর সমন্বয়। এই পদ্ধতি দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পূর্ণ নিজস্ব। অত্যন্ত কোমল বস্তু প্রকাশ পেয়েছে চমৎকার বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে। উদাহরণস্বরূপ "এস প্রাণসখা এস প্রাণে" গানটির উল্লেখ করা যায়।

একি জ্যোৎস্না গর্বিত শর্বরী
একি পাণ্ডুর তারপুঞ্জ
একি সুন্দর নীরব মেদিনী
একি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ

সঞ্চারীর এই অংশটি সুরে কী গাম্ভীর্যের সঙ্গে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল আবেগ। অত্যন্ত স্নিগ্ধ স্বাভাবিক এবং মর্মস্পর্শী একটা আকুলতা তাঁর গানকে অন্য সকলের সৃষ্টি থেকে পৃথক্ করে রেখেছে। শুধু প্রেমসঙ্গীতেই নয়, তাঁর ভক্তিরসাত্মক গানগুলিতেও এই বৈশিষ্ট্য অনন্যসাধারণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। "মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে প্রিয়তম তুমি আসিবে", "আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার", "ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়"—প্রভৃতি গানগুলি এর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

বস্তুত দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসঙ্গীত খুব কমই আলোচিত হয়েছে। অনেকে তাঁকে স্বদেশী সঙ্গীত রচয়িতা বলেই জানেন এবং অনেকের ধারণা, তিনি প্রধানত হাসির গানই রচনা করে গেছেন। কাব্য-সঙ্গীতের দিক থেকেও তাঁর দান যে কত অসামান্য সে খবর অনেকেই রাখেন না। তাঁর যে অল্প কয়েকটি গানের সুর আজও আমরা পাই যেগুলি একটির পর একটি বিচার করে গেলে দেখা যাবে, সেই দৃপ্তভঙ্গী, সেই আবেগ, সুরবিস্তারের সেই সহজ রূপটি কত স্বাভাবিক

এবং স্নন্দর। আজকের কাব্যসঙ্গীতেও তাঁর গান থেকে অনেক কিছুই নেওয়া যায়।

আজকাল তো প্রায় গানেই পাশ্চত্ত্য সঙ্গীতের অনেক রীতিনীতি প্রয়োগ করা হয় কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন সহজভাবে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে এইসব বৈচিত্র্য এনেছেন তার ধারে-কাছেও আধুনিক স্নরকাররা পৌঁছোতে পারেন নি। "মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে" গানটির শেষের কলি বা "আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই" প্রভৃতি গানের ক্রমিক আরোহণে যে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের ভঙ্গি এসেছে আজ-কালকার কোন গানেই সেই অনুপম ভঙ্গির লেশমাত্রও পাওয়া যাবে না। এর একটি প্রধান কারণ এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল রীতিমতো অর্থব্যয় করে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত শিখেছিলেন এবং ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গেও তাঁর নিগূঢ় পরিচয় ছিল! এই দুটি রীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলেই তিনি এদের মিল স্বাভাবিক নিয়মে করতে পেরেছিলেন, কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় তাঁকে নিতে হয় নি। আর এই পরিচয়টি নেই ব'লেই আজকালকার স্নর-রচনার নূতনত্বটি এক বিসদৃশ আকার নিয়ে দেখা দেয় যার কোন সত্যিকারের মূল্য আছে কিনা সন্দেহ।

বাঙ্গলার সঙ্গীতকে যাঁরা সংগঠন করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের মধ্যে একজন—শুধু একজন নয়, একজন প্রধান স্নরস্রষ্টা। স্নতরাং বাঙ্গলার সঙ্গীতকে যদি জানতে হয় তবে তাঁকে বাদ দিলে সে জানা সম্পূর্ণ হবে না। হয়তো তাঁর কোন কোন রচনা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক এখানকার আসরে বসে গাইবার মতো আধুনিক বলে বিবেচিত হবে না, কিন্তু তবু এই গানগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে, সেকালের তুলনায় এগুলি ছিল কত অগ্রসর এবং সাঙ্গীতিক মূল্যসম্পন্ন। "আজি এসেছি বঁধুহে" গানটি একটি এই ধরনের পুরোনো গান কিন্তু এখনো যখন এই গানটি প্রকৃত স্নরে শুনতে পাই তখন মন আনন্দে নেচে ওঠে—এসব গানের বাঁধুনি এবং সৌন্দর্য এখনো বিস্ময়কর লাগে। সঙ্গীতের শিক্ষার দিক থেকে, ইতিহাসের দিক থেকে বা আলোচনার

দিক থেকে বিচার করলে পুরাতন সুরস্রষ্টাদের অবহেলিত রাখাটা একটা মস্ত ভুল—এটা স্বীকার করতেই হবে। প্রকৃত শিক্ষা পেলে এটা নতুন এটা পুরোনো, সেকেলে—এই ভাবটা থাকে না, তখন সঙ্গীতে এমন একটা রসের সন্ধান পাওয়া যায় যা চিরন্তন। তখনই একজন শিল্পী প্রকৃত শিল্পীর গৌরব অর্জন করেন, তাঁর দিব্য-দৃষ্টি লাভ হয়।

আজকাল রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনে লক্ষ্য করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের খুব প্রাচীন গানের প্রতি অনেকের গভীর আগ্রহ। ছোট খাট টপ্পার স্পর্শ দেওয়া বা আড়খেমটা জাতীয় খুব সহজ সরল গান অনেকে বেছে নিয়ে গান। আধুনিক যুগের বহু কারুকলাসমন্বিত গানের মাঝখানে এই যে পুরাতন এবং সহজ গানগুলি, এগুলি কিসের টানে শিল্পীদের মনে ভেসে আসে? এর উত্তর হচ্ছে প্রকৃত সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য। এই পুরোনো সহজ সরল গানগুলির মধ্যে যে মাধুর্য পাওয়া যায় আজকের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও সে হয়তো দুর্লভ। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের গানের দিকেও আমাদের আগ্রহ ফিরে আসছে—প্রাচীন বাঙ্গলা টপ্পাও আজ-কাল মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, তাদের সারল্য এবং মাধুর্য আমাদের আকৃষ্ট করেছে। তাই বলছি, দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন তাঁরা যদি দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীত অনুশীলন করেন তবে তার মধ্যেও প্রকৃত রসমাধুর্যের আস্বাদ পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠবেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত সঙ্গীতরূপটি থিয়েটারের জন্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সাধারণত রঙ্গালয়ের অভিনয়ে যে সুরে দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হয় তাতে বিকৃতির পরিমাণ এত অধিক যে, এর দরুনই বোধহয় অনেকে দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্বন্ধে তেমন উচ্চ ধারণা পোষণ করতে পারেন না। দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তার আসল সুরটি ভাল করে শেখা এবং জানা দরকার। এইটি জানলে দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃত রসটি উপলব্ধি করা যাবে এবং এটাও বোঝা যাবে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের সুরে গায়কের স্বাধীনতা কত উন্মুক্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল

সেই শ্রেণীর সুরস্রষ্টা ছিলেন যিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও শিল্পীকে সুরবিহারের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন।

১৮৬৩ (বাংলা ১২৭০) সালের ৪ঠা শ্রাবণ দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সে-যুগের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি কৃষ্ণনগরের রাজসরকারের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য এবং সঙ্গীত-প্রতিভা অল্পবয়সেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রথম গ্রন্থ আর্যগাথা প্রথম ভাগের গানগুলি রচিত হয় বারো থেকে সতেরো বৎসর বয়সের মধ্যে। যে বৎসর তিনি হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সেই বৎসরেই এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। এম. এ. পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে তিনি যখন শিক্ষকতায় নিযুক্ত তখন বিলাতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করলেন।

বিলাতে থাকবার সময় তিনি ইংরেজিতে অনেকগুলি কবিতা লিখেছিলেন। এগুলি Lyrics of Ind. গ্রন্থে মুদ্রিত করেন। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে শিক্ষাও তিনি বিলাতেই গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তিটি বেশ চিত্তাকর্ষক।—

"আমি সলজ্জে স্বীকার করি যে, এককালে আমারও ইংরাজি গানে বিশুদ্ধ ও আন্তরিক ঘৃণা ছিল। আমি যেদিন ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান সঙ্গীত রচয়িতার রচিত সর্বোত্তম Oratoria শুনিতে টিকিট কিনিয়া আলবার্ট হলে প্রবেশ করিলাম ও গুটিকতক গান শুনিলাম, সেদিন ইংরাজি সঙ্গীতের হীনত্ব ও অপদার্থত্ব আরও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি অবজ্ঞায় আলবার্ট হল পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে দ্রুত পদচারণ করিয়া, একেবারে শয়নকক্ষে উপনীত হইলাম এবং কেন যে লোকে পয়সা খরচ করিয়া এরূপ সঙ্গীত শোনে ইহা পর্যালোচনা করিতে করিতে শয়ন করিয়া কতক শান্তি উপভোগ করিলাম। ক্রমে বিলাত প্রবাসে নানা বন্ধুর নিকট ছোটখাট ইংরাজী গান শুনিতে

শুনিতে ভাবিলাম "বাঃ, এ মন্দই বা কি ?" ক্রমে তাহার অনুরাগী হইয়া আরও শুনিতে চাহিতাম এবং শেষে আমার ইংরাজি গান শিখিবার প্রবৃত্তি হইল ও পয়সা দিয়া গান শিখিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে প্রমাণ হয় প্রথমত যে, মানুষের প্রবৃত্তি কি পরিবর্তনশীল ও দ্বিতীয়ত যে, প্রথম ধারণা সব সময় ঠিক নহে।"

পরবর্তীকালে এইসব পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের শৈলী তিনি বাংলাগানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চমৎকারভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। এ ছাড়াও হুবহু অনুবাদ করেছিলেন বহু স্কচ, ইংরেজী এবং আইরিশ গান। এর মধ্যে টম মুরের "Go where glory waits thee" নামক বিখ্যাত গানের অনুবাদও ছিল। এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ এইসব গানের সুর গ্রহণ করেন নি। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের এইসব গান তেমন প্রচলিত হয় নি কেননা সাহিত্যের দিক থেকে এগুলির তেমন মূল্য নেই আর সঙ্গীতের দিক থেকেও নিছক পাশ্চাত্ত্য ধারা আমাদের কাব্যসঙ্গীতে বোধ হয় তেমন পছন্দসই হয় নি। অথচ একেবারে খাঁটি পাশ্চাত্ত্য ঢঙে রচিত হাসির গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল কেননা এক্ষেত্রে সুর নির্বাচনটি লোকের মনের মত হয়েছিল।

তিন বছর বিলাতে কাটিয়ে কৃষিবিদ্যার ডিগ্রি নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। দেশে ফিরে ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করলেন। সাহেব ভেবেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল চাকরির জন্য তাঁকে বেশ একটু খোশামুদি করবেন কিন্তু তাঁর প্রকৃতিই ছিল উল্টো। একে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ব্যক্তি তার ওপর স্বাধীন দেশের আবহাওয়ায় কিছুকাল কাটিয়ে এসে ছোটলাটের সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি কোনরকম হীনতা প্রকাশ করলেন না। ফলে যেখানে তাঁর ষ্ট্যাটিউটারি সিভিলিয়ান হবার কথা সেখানে তাঁকে দেওয়া হোলো ডেপুটির পদ। এই স্বাধীন মনোভাব তাঁর বরাবরই ছিল। এবং এরই জন্য চাকুরি জীবনে তাঁকে যথেষ্ট বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে। তার ওপর সাহিত্যে স্বাদেশিকতার জন্য শেষ জীবনে তাঁকে ক্রমাগত এখান থেকে ওখানে বদলি

করে ইংরেজ সরকার তাঁর ওপর অত্যাচার করতে কিছুই বাকী রাখে নি।

সরকারী কাজ নেবার অল্পকাল পরেই তিনি প্রসিদ্ধ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে কর্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি মুঙ্গেরে সেটল্‌মেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি অনেক গান এবং কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর হাসির গানও এই সময়েই শুরু হয়। নবরচিত কাব্যসঙ্গীতগুলি "আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ" নাম দিয়ে প্রকাশিত করেন। এর অনেকগুলি গান পরে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

মুঙ্গেরে থাকতে তিনি নিয়মিতভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের অনুশীলন করতে আরম্ভ করেন। বিখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এই সময়ে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে মুঙ্গেরে অবস্থান করছিলেন। দ্বিজেন্দ্র-লাল এঁদের সাহচর্যে এবং রীতিমত ওস্তাদের সহায়তায় কিছুকাল সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি টপ্‌-খেয়াল জাতীয় গানের মূলে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান। এই সময় থেকে পত্নীবিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য জীবনের সবচেয়ে আনন্দ-ময় যুগ। স্ত্রীর মৃত্যুকালে তাঁর বয়স চল্লিশ এবং এরপর থেকেই তিনি ধীরে ধীরে আনন্দ উচ্ছ্বাস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

এরপরে এলো তাঁর নাটক রচনার যুগ। কলকাতায় এবং বাইরে নানাস্থানে তিনি নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেন এবং স্বাদেশিকতার উগ্র আন্দোলনেও যোগদান করেন। বহু জায়গায় ঘোরাঘুরির পর তিনি গয়ায় বদলি হয়ে এলেন এবং এইখানে তাঁর জীবনের আর একটি সার্থক অধ্যায় রচিত হয়।

গয়াতে তিনি প্রিয়বন্ধু মনস্বী লোকেন্দ্র পালিতের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন। পালিত সাহেব প্রতি সন্ধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সাহিত্যালোচনায় মগ্ন থাকতেন। এটা তাঁর শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রী এবং উচ্চ

রাজকর্মচারীদের ক্লাবের অনুমোদিত ছিল না কিন্তু তাতে তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। যে রাত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিখ্যাত গান "বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ" রচনা ক'রে লোকেন্দ্রনাথকে শোনালেন সেই রাত্রে তাঁর আনন্দ-উচ্ছ্বাস উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে এই সঙ্গীত-রচনাটি একটি বিশেষ ঘটনা। এই গানটিই বোধ হয় পরোক্ষভাবে তাঁর মৃত্যুর জন্যও দায়ী। যখনই তিনি এ গানটি গাইতেন তখনই দারুণ উত্তেজনা অনুভব করতেন এবং পরিশেষে এই থেকেই তাঁর গুরুতর শিরঃপীড়ার উদ্ভব হয় যার ফলে শেষ পর্যন্ত মাত্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হ'ল।

গয়াতে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালকে স্বদেশী-সঙ্গীত রচনা সম্পর্কে একটি বিবেচ্য পরামর্শ দিয়ে যান। এ সম্বন্ধে তাঁর চরিতকার যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি একটু তুলে দিচ্ছি।

"—কথা প্রসঙ্গে সেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি গান শুনিয়া জগদীশবাবু বলেন—

"আপনি রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির অনুপম চরিতগাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে কিন্তু তাঁরা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন। এখন এমন আদর্শ বাঙ্গালীকে দেখাইতে হইবে—যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাঙ্গলাদেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উঠিয়া সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন তো একবার সেই আদর্শ এ বাঙ্গালী জাতিকে দেখাইয়া আবার তাহাদিগকে জীয়াইয়া মাতাইয়া তুলুন।"……এই স্মরণীয় ঘটনার মাস তিনেক পরে, পূজার সময়ে আমি সেবার গয়ায় গিয়া কিছুকাল আমার সুহৃত্তমের অতিথি হইয়াছিলাম।……একদিন, বোধহয় অষ্টমী পূজার দিন—দুপুর বেলায় আহারান্তে দুজনে বসিয়া আছি, কবিবর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"দেখ আমার মাথার মধ্যে একটা

গানের কয়েকটা লাইন আসিয়া ভারি জ্বালাতন করিতেছে। তুমি একটু বোসো ভাই—আমি সেগুলো গেঁথে নিয়ে আসি।" অর্ধঘণ্টা বা তাহারও কিছু অধিককাল একাকী বসিয়া রহিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন দূর হইতে হাততালি দিয়া গুন গুন করিয়া গাইতে গাইতে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়া কহিলেন—"উঃ কি চমৎকার গানই লিখেছি! শুনবে? —শুনবে নাকি? আচ্ছা তবে শোন।" এই বলিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

"বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ"—ইত্যাদি।

......গান শেষ করিয়া বন্ধু বলিলেন—"কি কেমন লাগল?" আমি বলিলাম—"ধন্য আপনি।" বালস্বভাব দ্বিজেন্দ্রলাল একবার—শুধু একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। পরে আর কিছু না বলিয়া, হাতে তালি দিতে দিতে, সারাটা ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া নাচিয়া আবার গাইতে লাগিলেন,—

"কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।"

এই গানটিতে তিনি নিজেই যে শুধু মেতে উঠেছিলেন তাই নয় সারা বাংলা দেশই মেতে উঠেছিল। আজও এ গান আমাদের প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করে। গয়ায় তিনি বছর তিনেক ছিলেন। সরকারের বিরুদ্ধাচরণে ক্রমাগত উৎপীড়িত হয়ে অবশেষে দীর্ঘ দেড় বৎসরের "ফার্লো" নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন।

তাঁর বড় বড় নাটকগুলি শেষজীবনে গয়ায় এবং কলকাতায় বসেই লেখা। প্রসিদ্ধ আটখানি গ্রন্থ তিনি চার বছরের মধ্যেই প্রকাশিত করেন।

শেষজীবনে সবচেয়ে বড় দুঃখকর ঘটনা হোলো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য বিরোধ, যদিও তিনি বরাবরই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ গুণ-গ্রাহী ছিলেন। আজকের দিনে ভেবে দেখলে এই বিরোধের কারণটা

নিতান্ত ছেলেমানুষি বলেই মনে হয়। তবু এটা হয়েছিল এবং এর জন্য প্রধানত দায়ী জনকয়েক স্বার্থপর এবং কুটিল ব্যক্তি যাঁরা দ্বিজেন্দ্রলালকে ক্রমাগত অন্যায়ভাবে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। যাই হোক, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষ পত্রিকায় তিনি রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করে নিজেই এই বিরোধের অবসান করে যান।

দীর্ঘ ছুটির পরে তিনি আবার কাজে যোগদান করেন কিন্তু বেশীদিন কাজ করতে পারলেন না, অতিরিক্ত ব্লাডপ্রেসারের জন্য আবার বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। মৃত্যুর পূর্বে আর তিনি কলকাতা ছাড়েন নি।

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার কালভার্ট তাঁকে একেবারে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মত মজলিসি লোকের পক্ষে সেটা কোনক্রমেই সম্ভব হয়ে উঠল না। ইণ্ডিয়া ক্লাব, ডাকাত ক্লাব এবং পূর্ণিমা-মিলনের মত প্রতিষ্ঠানের নায়ক দ্বিজেন্দ্রলাল চুপচাপ বসে থাকবার লোক ছিলেন না। সাহিত্য-চর্চা, গান এবং তর্ক চলতেই থাকল। অবশেষে ১৭ই মে ১৯১৩ সালে মৃত্যু তাঁকে সহসা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

সেদিন শনিবার। রাত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের "ভীষ্ম" নাটক দেখতে যাবার কথা—সন্ধ্যা থেকে কবি একটা ফরাসের ওপর একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে 'সিংহল-বিজয়' নাটকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করছিলেন। একসময় ক্লান্তি এলো। তাকিয়ায় মাথা রেখে দু'হাত তুলে আলস্য ভাঙলেন। সহসা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চীৎকার করে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। মাথার একটা সূক্ষ্ম শিরা কোথায় অতর্কিতে ছিঁড়ে গেল। চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে এলো। সাধ্যমত চিকিৎসাও চলল। কিন্তু কিছুই করা গেল না। রাত প্রায় ন'টার সময় তিনি একবার চোখ মেলে চাইলেন। মৃত্যুর পূর্বে অস্পষ্ট স্বরে একবার প্রিয়তম পুত্রকে ডাকলেন—"মণ্টু"।

রজনীকান্ত সেন

বর্তমান যুগের প্রারম্ভে যাঁরা সঙ্গীত রচনা করেছেন, তাঁদের বিষয় যখন আলোচনা করতে বসি, তখন যে প্রধান অভাবটা বোধ করি, সে হচ্ছে তাঁদের গানের স্বরলিপির স্বল্পতা। বহু গানের সুর হারিয়ে গেছে, তাদের আর ফিরে পাবার উপায় নেই। অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা ঘটেছে—কান্তকবি রজনীকান্তের প্রসঙ্গে এসেও দেখছি আজকের দিনে অনেকেই তাঁর অনেক গান জানেন না। একদিন যখন কান্তকবির গান সারা বাংলা জুড়ে চলেছিল তখন একথাটা কারুর মনে পড়ে নি যে, তাঁর গানের স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশ করা দরকার—ইতস্ততবিক্ষিপ্তভাবে সঙ্গীত-প্রকাশিকার মতো কাগজে দু-চারটে গানের স্বরলিপি বেরিয়েছিল,—এই যা, আর কোন উদ্যম দেখা যায় নি। তার পরে সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকাতেও অল্প কিছু গানের স্বরলিপি বেরিয়েছে। এই সময়েও গ্রামোফোন কোম্পানীতে খোঁজ করলে রজনীকান্তের অনেক পুরনো গানের রেকর্ড পাওয়া যেত। কিন্তু এই পরিশ্রম কে করে? আজও কেউ করে না। ইতিহাসের জন্য কোন প্রচেষ্টা স্বভাবতই আমাদের মনোভাবের মধ্যে নেই, সঙ্গীত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রযত্ন যে আরও কম হবে বলাই বাহুল্য। আজ রজনীকান্তকে স্মরণ করে দুঃখের সঙ্গে এই কথাটাই মনে পড়ছে। এই শ্রাবণেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর পূর্বে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ভাদ্র মাসের শেষে—সেও আজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর হয়ে গেল।

আমাদের সঙ্গীতজগতে রজনীকান্তের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। মরমী স্রষ্টা হিসাবেই তিনি এই স্থানটিতে অভিষিক্ত। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ বা দ্বিজেন্দ্রলাল যে বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন রজনীকান্ত হয়তো ততটা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি,

কিন্তু তাঁর সঙ্গীত বাঙ্গালীর মর্মে পৌঁছেছে—তাঁর গানের কারুণ্য, স্নিগ্ধতা, সারল্য একটি নিবিড় সঙ্গীতরসে মনকে পরিপ্লুত করে রাখে—তাই তিনি আমাদের কান্তকবি, আমাদের একান্ত পরিচিত সুর-স্রষ্টা।

রজনীকান্তের সুরের মূল বৈশিষ্ট্য রাগমিশ্রণের সূক্ষ্মতায় নয়—সুরের দিক থেকে তিনি খুব একটা কলাকৌশল সম্পাদনের দিকে যান নি, ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা নিয়ে যে তিনি পরীক্ষা করেছেন তাও নয়—তাঁর রচনায় তিনি এক অতি পবিত্র শান্তরসের সান্দ্র পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এই শান্তরসই তাঁর সঙ্গীতের মূল আবেদন। সঙ্গীতের দিক থেকে এই অকৃত্রিম সরল শান্তরস পরিবেশন করা খুব সহজ কাজ নয়। বস্তুত এই সহজ জিনিসটা আসলে বড়ই শক্ত। সরল সহজ জীবনযাপন করা শক্ত, সাহিত্যের এবং শিল্পের ক্ষেত্রেও সহজ এবং সরল রচনা সুকঠিন ব্যাপার। তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একটি সহজ, সরল এবং সুন্দর রচনা দুর্লভ। যে কোন বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে একটি সুন্দর, সরল এবং স্বাভাবিক সৃষ্টি হয় না। রজনীকান্ত তাঁর সুগভীর রসবোধ থেকে এই সুন্দর সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। দুঃখ, শোক, আকুলতা, শ্রদ্ধা, সমর্পণ—প্রতিটি বিচিত্র অনুভূতি দিয়ে গড়া তাঁর সুর হৃদয়ের গহন থেকে স্বতঃ-উৎসারিত হয়ে এসেছে এবং তার স্বচ্ছ, সরল, সুন্দর গতি শ্রোতাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে স্নিগ্ধ রসাবেশে চিত্তকে শান্তিতে নিমগ্ন করে দিয়েছে। তাঁর সুরের এইটিই প্রধান এবং মূল কথা।

সুরমাধুর্য বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন-ভাবে ফুটিয়েছেন। শান্তরসাশ্রিত ভক্তিমূলক গান অনেকে টপ্পার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, অনেকে নানা রকম রাগমিশ্রণের সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু রজনীকান্ত এই দুটোর কোনটিই করেন নি, তাঁর সুর প্রধানত ফুটে উঠেছে ছন্দের লীলায়িত হিল্লোলে। রজনীকান্তের কাব্য ছন্দপ্রধান এবং সুরও এই ছন্দকে অনুসরণ করে সংগঠিত হয়েছে। তাঁর বেহাগ, খাম্বাজ, ইমন কল্যাণ, কানাড়া, ভৈরবী প্রভৃতি সুরের মধ্যে খুব যে অসাধারণত্ব আছে এমন

নয়, কিন্তু বিচিত্র ছন্দের মধ্যে সুরটি এমন চমৎকারভাবে খেলে যাচ্ছে যে, তার ভিতর থেকে একটা অসাধারণ আভাস মাঝে মাঝে মনকে চমক লাগিয়ে দিয়ে যেতে থাকে এবং এই কারণেই রজনীকান্তের গানের সুর একঘেয়ে হয়ে ওঠে নি যদিচ তাঁর অনেক গানে পর পর একই সুরে অনেকগুলি কলি আছে। উদাহরণস্বরূপ "তব চরণ নিম্নে শ্যাম ধরণী", "যদি মরমে লুকায়ে রবে", "কতভাবে বিরাজিছ বিশ্ব মাঝারে" প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য। "তোমারই দেওয়া প্রাণে", "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব"—এই দুটি গানের ছন্দবিভাগ চমৎকার এবং রূপকড়া তালে (অর্থাৎ ৩+২+৩=৮ মাত্রা—এই ছন্দ) গাইলেও বিশেষ উপভোগ্য হয়। বহু গানে এইরকম বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে, এমন কি কীর্তনাঙ্গ গানেও তিনি ছন্দের ওপর কেমন সুন্দর কাজ করেছেন। "কুটিল কুপথ ধরিয়া" এই গানটি এর একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। ছন্দ এবং সুর দুটিরই চমৎকার সমন্বয় করা হয়েছে এমন গানও অনেক আছে, যেমন—"আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে", "কেন বঞ্চিত হব চরণে", "কে রে হৃদয়ে জাগে", "তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে" প্রভৃতি রচনা। "তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে" এই বিখ্যাত গানটিতে ভৈরবীতে বিস্তার করে গাইবারও সুযোগ রয়েছে প্রচুর। লোক-সঙ্গীতের মধ্যে বাউল ঢঙের গানেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যথা তাঁর বিখ্যাত স্বদেশ-সঙ্গীত "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই"। এই রকম সহজ সরল সুরে তাঁর আরও অনেক স্বদেশ-সঙ্গীত রচিত হয়েছে

বস্তুত রজনীকান্তের শ্রেষ্ঠ রচনা ভক্তিগীতি এবং এই রচনায় তান বিস্তারের বাহুল্য নেই, রাগ মিশ্রণের সূক্ষ্ম কারুকার্য নেই, কিন্তু এতে রাগ-সঙ্গীতের পরিচয় আছে, সুরের মনোহারিত্ব আছে, ভাষার লালিত্য আছে—আর সব মিলিয়ে নানা ছন্দের সংযোগে এ রচনা একান্ত-ভাবেই কাব্যসঙ্গীত এবং রজনীকান্তের নিজস্ব। তাঁর নিজস্ব রীতিটি তাঁর রচনায় হারিয়ে যাবার উপায় নেই, কেননা তাঁর গানে

শিল্পীর যে স্বাধীনতা আছে, তাতে সীমা অতিক্রম করবার সুযোগ নেই—আবার একেবারে সুরের বাঁধা সড়ক না মেনে চললেও পারেন। সুতরাং রজনীকান্তের নিজস্ব ভঙ্গীটি সব সময়েই তাঁর গানে বিদ্যমান থাকবে।

রজনীকান্ত ১৮৬৫ সালের ২৬শে জুলাই (বাংলা ১২৭২—১২ই শ্রাবণ) পাবনার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত ভাঙ্গাবাড়ী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গুরুপ্রসাদ মুন্সেফ থেকে সাবজজ পর্যন্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আইন আদালত নিয়েই তিনি আবদ্ধ থাকেন নি, সঙ্গীতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। রজনীকান্ত এই কারণেই বাল্যকাল থেকে সঙ্গীত অভ্যাসের সুযোগ পেয়েছিলেন। শোনা যায়, মাত্র চার বৎসর বয়সেই তিনি আধো আধো ভাষায় রামপ্রসাদী গান গাইতে শিখেছিলেন।

রাজসাহীতে স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি সেখানকার কলেজ থেকেই এফ. এ. পাশ করেন। কলেজে প্রবেশ করবার অল্পকাল পরেই তাঁর বিবাহ হয়। অতঃপর কলকাতায় এসে সিটি কলেজ থেকে বি. এ. এবং বি. এল. পাশ করে রাজসাহীতে ফিরে গিয়ে উকিল হয়ে বসলেন। বসলেন বটে, কিন্তু ওকালতিতে তাঁর মন ছিল না এবং উক্ত ব্যবসায়ে কতকটা ইচ্ছে করেই তেমন প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা করেন নি।

এই সময়ে তাঁর কাব্য এবং সঙ্গীত সাধনা পুরোদমে শুরু হয়েছিল—প্রধান উৎসাহদাত্রী তাঁরই সহধর্মিণী। অতএব রাজসাহীতেই বাড়ি করে পাকাপাকি বাস করতে লাগলেন। ওকালতি এবং কাব্য-সঙ্গীত সাধনা এক সঙ্গেই চলতে থাকল।

রাজসাহীতে "উৎসাহ" নামক একটি পত্রিকা বেরিয়েছিল ১৩০৪ সালে এবং চলেছিল বছর তিন-চার। রজনীকান্ত এই পত্রিকায় গান লিখতেন এবং এসব গান নানা সম্মিলনীতে স্বকণ্ঠে প্রচার করে অচিরেই তিনি সমস্ত রাজসাহীতে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন। এই সময়

তিনি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের কাছ থেকে বিশেষ স্নেহ এবং প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

একবার রাজসাহীর লাইব্রেরীতে একটা সভার আয়োজন হয়েছে। বেলা প্রায় তিনটের সময় রজনীকান্ত এলেন অক্ষয় মৈত্রেয়ের বাড়িতে—তাঁকে নিয়ে সভায় যাবেন। অক্ষয় বললেন—"রজনী-ভায়া, খালি হাতে সভায় যাবে—একটা গানই না হয় বেঁধে নাও।" কথাটা হ'ল জলধর সেন মহাশয়ের সামনে। রজনীকান্ত যে সঙ্গীত রচয়িতা সেটা তখন তাঁর জানা ছিল না—অবশ্য রজনীকান্ত গান গাইতে পারতেন, সেটা তিনি জানতেন। জলধর বাবুকে রজনীকান্তের এই পরিচয়টা দিয়ে অক্ষয় মৈত্রেয় বললেন—"রজনী একটু বসলেই গান বাঁধতে পারে।" রজনীকান্ত মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলে খাতা খুলে বসলেন। বেশিক্ষণ ভাবতে হল না—গানটি লিখে নিয়ে এসে তিনি দাখিল করলেন মৈত্রেয় মহাশয়ের কাছে। এত অল্পক্ষণের মধ্যে গান লেখা! জলধর বাবু গানটি নিয়ে পড়লেন। একটু অবাক হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রচনাটি পড়ে আরও অবাক হলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে রচিত গানটি পরে বিশেষ বিখ্যাত সঙ্গীতরূপে পরিগণিত হয়—

"তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা
ঊর্ধ্বে চাহ অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভোনীলাঞ্চলা,
সৌম্য মধুর দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা"……

এর পর ধীরে ধীরে রজনীকান্তের সঙ্গীত রচনার খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বই ছাপাতে কিছু সঙ্কোচ বোধ করছিলেন—যদি তাঁর রচনা অসার প্রতিপন্ন হয়। সুরেশ সমাজপতির তখন প্রবল প্রতাপ। রজনীকান্ত তাঁর শ্লেষকেই বিশেষ ভয় করতেন। ব্যাপারটা জেনে একদিন অক্ষয়কুমার জলধর সেনের বাড়িতে সমাজপতিকে আমন্ত্রণ করে এনে রজনীকান্তকে গান

গাইতে বসিয়ে দিলেন। তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে সমাজপতি নিজেই তাঁর গানগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের কথা পাড়লেন। তার পরে এলবার্ট হলের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গানের পর রজনী-কান্তের গানও যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল।

১৯০২ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ "বাণী" প্রকাশিত হল—তার তিন বছর পরে "কল্যাণী"। বাংলা সাহিত্যে খুব কম কাব্যগ্রন্থই এই দুই গ্রন্থের মত সমাদর পেয়েছে। ভক্তিগীতি, প্রীতি-গীতি ছাড়াও এই গ্রন্থদ্বয়ে কয়েকটি অনুপম দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও হাস্যরসাত্মক গীত স্থান পেয়েছে। ১৯০৫ সালে রজনীকান্তের অনেক স্বদেশ সঙ্গীত লোকের মুখে মুখে ফিরত। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর এই সব গানগুলি সমভাবে সমাদৃত হয়েছে সে যুগে।

বাংলা ১৩১৬ সালে তাঁর গলার ক্ষত ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ক্যানসারে পরিণত হয়। এই ব্যাধিতে তিনি শেষ জীবনে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ক্রমে চিররুদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তথাপি এই অবস্থাতেও তিনি কাব্যরচনা করেছেন। হাসপাতালে থেকে তিনি "অমৃত", "আনন্দময়ী" ও "অভয়া" নামক তিনটি কাব্য রচনা করেন এবং তাঁর আরও কতকগুলি কবিতা "সদ্ভাবশতক" ও "শেষ দান"-এ প্রকাশিত হয়। এই যন্ত্রণাকাতর চিত্তে তিনি বিশ্বনিয়ন্তাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে লিখেছিলেন—

"আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ,
গর্ব করিতে চূর,
যশ ও অর্থ মান ও স্বাস্থ্য সকলি করেছ দূর।
ঐগুলো সব মায়াময় রূপে
ফেলেছিল মোরে অহমিকা কূপে
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল করেছ দীন আতুর
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব করেছ চূর।"……

মৃত্যুর পূর্বে রজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এবং কবিগুরু হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কান্তকবি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাঁর কথাগুলি লিখে দেখালেন বিশ্বকবিকে। রবীন্দ্রনাথেরই রচনা থেকে তাঁর বিশেষ প্রিয় কয়েকটি ছত্র স্মৃতি থেকে লিখে গেলেন—কবিকে জানালেন কত আগ্রহের সঙ্গে তিনি পাঠ করেছেন তাঁর রচনা। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে এলেন এই মৃত্যুপথযাত্রী শান্ত সাধককে। বোলপুরে ফিরে এসে তিনি লিখেছিলেন—

"সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম।······কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই ; পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে। মানুষের আত্মার সত্য প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশীর ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য !······ঈশ্বর যাহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন, আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।"

বাংলা ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র কান্তকবি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁর দেহ ভাগীরথী তীরে নিয়ে যেতে যেতে করুণ শান্ত

বেহাগে রচিত তাঁরই প্রিয় গানটি গেয়ে চল্লেন অনুরাগী অনুগমন-কারিগণ—

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল
তোমারি করুণা চন্দনে
কবে, তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি হারা
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা
এদেহ শিহরিবে ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলকস্পন্দনে।
কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া
চরণ টলিবে না হৃদয় গলিবে না
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।"

অতুলপ্রসাদ

শিল্পীরা সাধনার একটা স্তরে আসেন, সে স্তর উপলব্ধির স্তর। তখন এমন একটা বোধ মনকে জাগ্রত করে, যার স্পর্শে শিল্পীর সমগ্র সৃষ্টি একটা চেতনা, একটা সৌন্দর্য এবং মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। খুব কম শিল্পীই এই স্তরে উন্নীত হ'তে পারেন। আমাদের সঙ্গীত জগতে যাঁরা দিব্য অনুভূতির এই স্পর্শ লাভ করেছেন তাঁদের সংখ্যা স্বল্প এবং এই স্বল্পসংখ্যক সঙ্গীতসাধকের মধ্যে অতুলপ্রসাদ অন্যতম।

অতুলপ্রসাদের সুর যখন বিশ্লেষণ করে দেখি তখন তাঁর দু'টি বৈশিষ্ট্যই বিশেষ ক'রে মনে আসে, একটি সুরের সরল স্বাভাবিক গতি, অপরটি গভীর অনুভূতি। এই সুগভীর অনুভূতিই বোধ হয় তাঁর সঙ্গীতে কাব্য এবং সুর—এই দু'টি অঙ্গের প্রধান বিশেষত্ব। সাধারণের মধ্যেও অতুলপ্রসাদ এনেছেন অসাধারণ আবেদন একমাত্র এই হৃদয়াবেগ এবং অনুভূতির স্পর্শে। তাঁর সুরে করুণরসের প্রাধান্য, কেননা তাঁর জীবনে দুঃখ এবং বেদনা বার বার আঘাত হেনেছে। এই বেদনার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর সুরের মধ্যে এক উদার করুণ স্নিগ্ধতায়। তাঁর একটি গানে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে।

আমায় ক্ষমা করিও যদি তোমারে জাগায়ে থাকি
দুদিন গাহিয়া গান চলিয়া যাইবে পাখি।
তোমার নিকুঞ্জ শাখা
বসন্ত পবন মাখা
প্রাণের কোকিলে বল কেমনে ভুলায়ে রাখি।
নিঠুর সংসার বনে
শুষ্ক তৃণ আহরণে
কাটি যাবে দিবা তাই কাতরে তোমায় ডাকি।

আমার করুণ গানে
যদি দুখস্মৃতি আনে
ফুরাইয়া গেলে গান মুছিয়া ফেলিও আঁখি।

এই যে করুণরস এ শুধু প্রেমসঙ্গীতেই নয়, তাঁর প্রতি বৈচিত্র্যের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর জীবনবীণা বেদনায় বাঁধা আর সুন্দরের স্পর্শে বার বার সেই বীণা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে।—

তুমি গাও তুমি গাও গো
গাহ মম জীবনে বসি, বেদনে বাঁধা জীবনবীণা
ঝঙ্কারি বাজাও গো
তুমি গাও।
তোমার পানে চাহিয়া, চলিব তরী বাহিয়া
অভয় গান গাহি ভয় ভাবনা ভুলাও।
তুমি গাও।
দগ্ধ যবে চিত্ত হবে এ মরু সংসারে
স্নিগ্ধ কর মধুর সুরধারে।
তোমার যে সুরছন্দে পাখিরা গাহে আনন্দে
শিষ্য করি আমারে সে সঙ্গীত শিখাও
তুমি গাও।

এই অনুভূতি প্রকাশের ভাষা যেমন সরল, সুরে তার প্রকাশ-ভঙ্গিও তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক। কৃত্রিমতার লেশমাত্রও তাঁর রচনায় নেই অথচ রাগমিশ্রণে তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই রাগমিশ্রণের আবার এমনি একটা চমৎকার ধারা আছে যা'তে ক'রে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েও শিল্পীর সুরবিস্তারের সুযোগ বহুল পরিমাণে থেকে যায়। অতুলপ্রসাদের সুরে তাঁর ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি আছে কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব তাঁর সঙ্গীতকে একান্তভাবেই তাঁর নিজের গড়া সুরের কাঠামোয় বেঁধে রাখে নি, তা শিল্পীর নিজস্ব

ভঙ্গীর সহায়তায় অগ্রসর হয়ে চলেছে। শিল্পী এবং সুরস্রষ্টা একত্র মিলিত হ'তে পেরেছেন তাঁর রচনায়—এইখানেই তাঁর সৃষ্টির স্বার্থকতা।

অতুলপ্রসাদ যে রাগমিশ্রণের ধারা অবলম্বন করেছেন সে আমাদের রাগসঙ্গীতের রীতিকে অনুসরণ ক'রে চলেছে। তাঁর গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ব'সে হিন্দি গানের পরে গাইলেও একেবারে বেমানান হবে না, কেননা তাঁর অনেক গানে হিন্দি গানের বৈশিষ্ট্য আছে। উদাহরণস্বরূপ "আমার বাগানে এত ফুল" এই গানটির উল্লেখ করা যায়। শুনেছি, এই গানটির সঙ্গে একটি হিন্দি গানের সুরের সাদৃশ্যও আছে। "সে ডাকে আমারে"—আর একটি গান—এটি পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রচিত "ভবানী দয়ানী"—এই বিখ্যাত গানটির অনুসরণে রচিত।

আরও একটি সুন্দর গান আছে—"ডাকে কোয়েলা বারে বারে"। গৌরমল্লারে দস্তুরমত আসরে গাইবার গান এটি। "মুরলী কাঁদে রাধে রাধে বলে"—এই গানটি অতুলপ্রসাদের নিপুণ রাগমিশ্রণের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। 'আশাবরীকে কেন্দ্র ক'রে ভৈরবী, ভৈরোঁ প্রভৃতি নানা সুরের এক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়েছে এই গানটিতে। গাইতে গাইতে মন দ্রবীভূত হয়ে যায়, চোখের কোণে এসে পড়ে অশ্রুর রেখা। এমন সুন্দর গানটিকে কিন্তু আজকাল রেডিওতে মাঝে মাঝে অতিশয় বিকৃত সুরে শুনি। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই সুরটি কোন নামকরা অথচ অক্ষম শিল্পীর নিজস্ব অবদান—অতি মামুলি আশাবরীতে গানটি করা হচ্ছে আজকাল। "চাঁদনী রাতে কে গো আসিলে"—এই গানটি বহু মিশ্রণে সংগঠিত। "দেশ", "খাম্বাজ", "পিলু" প্রভৃতি বহু সুরের অতি সুন্দর সমাবেশ ঘটেছে এই গানটিতে। এইভাবে একটা-আধটা নয়, বহু গানই উল্লেখ ক'রে দেখানো যেতে পারে।

কাব্যসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও তিনি এইভাবে ছোটখাট রাগমিশ্রণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ—"এ মধুর রাতে", "আমার

পরাণ কোথা যায়", "কে আবার বাজায় বাঁশি", "জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরাণী", "বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে", "প্রভাতে যারে নন্দে পাখি", "তব পারে যাব কেমনে", "যাব না যাব না যাব না ঘরে", "তাহারে ভুলিব বল কেমনে" প্রভৃতি গানগুলির উল্লেখ করা যায়। এগুলি খাঁটি কাব্যসঙ্গীত কিন্তু রাগসঙ্গীতের স্পর্শে এদের প্রকৃতিতে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এসে গেছে।

অতুলপ্রসাদ খুব বেশী গান রচনা কবেন নি। "কাকলী", "কয়েকটি গান" এবং "গীতগুঞ্জ" এই তিনটি গ্রন্থে তাঁর যা কিছু গান সংকলিত রয়েছে। এই স্বল্প রচনার মধ্যেই কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগের বহু বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন। অতুলপ্রসাদের রচনায় একটি ব্যতিক্রম হচ্ছে ধ্রুপদাঙ্গ রীতির অভাব। বস্তুত "ক্ষমিও হে শিব"—এই গানটি ছাড়া ধ্রুপদভঙ্গীম রীতিতে তিনি আর কোন গান রচনা করেছেন কিনা সন্দেহ। এছাড়া অন্যান্য সমস্ত ঢঙেই তাঁর দু'-একটি অনবদ্য রচনা পাওয়া যায়। কীর্তনাঙ্গ গানে "ওগো সাথী মম সাথী", "আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়", "যদি তোর হৃদ যমুনা"—এগুলি অতি সমৃদ্ধ রচনা। বাউল ঢঙের গানে তিনি যে ভঙ্গী এনেছেন তা'তে তাঁর নিজস্ব রীতিও অনেকখানি রয়েছে এবং তার সঙ্গে মাঝে মাঝে রাগসঙ্গীতের স্পর্শও তিনি এনেছেন নিপুণভাবে। "প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল"—এই গানটির মনোহারিত্ব বর্ণনা ক'রে বোঝাবার নয়, শুনে উপলব্ধি করতে হয়। "কত কাল থাকব বসে", "ওরে বন তোর বিজনে", "মোদের গরব মোদের আশা"—এইসব গানগুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলতে হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে বাউল গানে এত বৈচিত্র্য কোথা থেকে আনলেন তিনি! বাংলা গজলেও বোধ হয় অতুলপ্রসাদই প্রথম হস্তক্ষেপ করেন এবং এই ঢঙে অল্প দু'-চারটি গান যা রচনা করে গেছেন তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে এমন গজল রচনা আজ পর্যন্ত বাংলা গানে হয় নি। গজল লিখিয়ে বাংলার গানে গত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মধ্যে তো কম হয় নি কিন্তু কই, "কত গান

তো হ'ল গাওয়া", "তব অন্তর এত মন্থর", "কে গো তুমি বিরহিনী", "জল কহে চল"—এইসব গানের সঙ্গে তুলনা হ'তে পারে এমন রচনা তো চোখে পড়ে না। বস্তুত "কত গান তো হ'ল গাওয়া"—আমাদের সঙ্গীতে এক অপূর্ব স্বৃষ্টি এবং এরকম স্বৃষ্টি একটি-দু'টির বেশি হয় না। এগুলি ছাড়া "কেন এলে মোর ঘরে", "ঝরিছে ঝর ঝর", "মোরা নাচি ফুলে ফুলে"—এই ধরনের গানগুলিতেও তাল এবং গায়নভঙ্গীর দিক থেকে বহু বিচিত্র রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানী লগনী, কাজরী প্রভৃতি রীতি অতুলপ্রসাদ চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন বাংলা গানে।

অতুলপ্রসাদের গানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল টপ্পার স্পর্শ। বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ খাম্বাজ রচনা করেছেন তিনি এবং এগুলিতে এনেছেন টপ্পার সুললিত কোমল করুণ তান। তাঁর গানে করুণ রসের প্রাধান্যের জন্যও স্পর্শগুলি অতীব মনোরম লেগে থাকে। "কে যেন আমারে বারে বারে চায়", "কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা", "তবু তোমারে ডাকি বারে বারে"—প্রভৃতি গানগুলি টপ্পার কারুণ্যে মর্মস্পর্শী হয়ে আছে।

স্বদেশী সঙ্গীতেও অতুলপ্রসাদ অতুলনীয়। "উঠগো ভারতলক্ষ্মী" গানটি ইংরেজী সুরের অনুকরণে রচনা করেছেন। "বল বল বল সবে", "হও ধরমেতে বীর"—এই সব গান এত অধিক প্রচলিত যে, এ সম্বন্ধে অধিক বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। স্বদেশী গানেও যে তিনি রাগসঙ্গীতের স্পর্শ আনেন নি এমন নয়। "ভারত ভানু কোথা লুকালে"—এই গানটি তেমন পরিচিত নয়। এটি শুনলে বোঝা যাবে খাম্বাজের কি সুন্দর মিশ্রণ এই গানটির দৃঢ়ভঙ্গির সঙ্গে হতাশার করুণ ভাবকেও প্রস্ফুটিত করেছে।

অতুলপ্রসাদের আরও অনেক গান আছে যার সুর হারিয়ে গেছে। সব গান স্বরলিপি করে রাখবার কথা কারও মনে হয় নি। বহু রেকর্ড এখন আর পাওয়া যায় না। এগুলি সংগ্রহ করে স্বরলিপি করার

বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কবি বিদেশে থাকাতেও অনেক গান তেমন-ভাবে আমাদের শিল্পীরা শিখতে পারেন নি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এখন আর এসব গানের সুর পাবার উপায় নেই।

গানের সুরের মত অতুলপ্রসাদের একটি বিস্তৃত জীবনীও পাওয়া যায় না। কত লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, কত সঙ্গীতজ্ঞ তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন—সে সব বৃত্তান্ত খুব কমই লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর বিস্তারিত জীবনকাহিনী পাওয়া গেলে সমসাময়িক সঙ্গীতেরও অনেক কিছুই জানতে পারা যেত। তাঁর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে যদি কেউ এই কাজটি করে যেতেন তবে নানাদিক থেকে অশেষ উপকার হ'ত।

অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম হয় ঢাকায় ১৮৭১ সালের ২৫শে অক্টোবর। তাঁর পিতা খ্যাতনামা চিকিৎসক রামপ্রসাদ সেন যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হন এবং উন্নত চরিত্রের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা-ভাজন ছিলেন। তের বৎসর বয়সে অতুলপ্রসাদ পিতৃহীন হয়ে তাঁর মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের গৃহে বাস করেন। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এর কিছুকাল পরে বিলাতে গিয়ে ১৮৯৪ সালে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে আসেন। বাংলায় তাঁর প্রসার জমল না, অতএব লখনউতে এসে তিনি নিজেকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

লখনউ-এ হিন্দিগানের বহুতর ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি সঙ্গীত সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন এবং এই দূর দেশ থেকে তাঁর গান ধীরে ধীরে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল।

অতুলপ্রসাদকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে বাংলার সংস্কৃতি বিশেষ-ভাবে প্রসার লাভ করেছে। সেখানে তিনি ছিলেন সবাইকার "অতুলদা"। "উত্তরা" নামক মাসিক পত্রিকা এবং "প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনী" স্থাপনের মূলে তাঁরই প্রেরণা বর্তমান। শুধু বাঙালী নয়, লখনউ-এর জনসাধারণ তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন যার প্রকাশ তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট রাজপথ—"এ. পি. সেন রোড"।

রাজনীতিতে যে তিনি যোগ দেন নি তা নয়। তিনি ছিলেন গোখেলের অনুবর্তী উদারনৈতিক মতাবলম্বী এবং জাতীয় উদারনীতিক সম্মেলনের সভাপতি পর্যন্ত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি "আউধ বার এসোসিয়েশন" এবং বার কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন।

এছাড়া যাবতীয় মঙ্গলকর কার্যের সঙ্গেই তাঁর যোগ ছিল। কতদিকে কত যে দান করে গেছেন তার হিসাব নেই। তাঁর উইলেও সম্পত্তির অধিকাংশ জনহিতার্থে দান করেছেন। অতুলপ্রসাদের কাছে হাত পেতে ফিরে গেছেন এমন কোন লোক নেই। অতিশয় বন্ধুবৎসল ছিলেন তিনি। কোন কারণেই কেউ তাঁর ওপর বিরক্ত হন নি, কোন বন্ধুর সঙ্গে বিরোধও হয় নি—তিনি ছিলেন ভদ্রতার প্রতীক। এমনও দেখা গেছে, বন্ধুজনের সঙ্গে তিনি কোন অনুষ্ঠানে চলেছেন বা কোন কারণে ব্যস্ত এমন সময় অপেক্ষমান মক্কেলের কাছ থেকে উচ্চ হারের "ফি"-র প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু তিনি অনায়াসেই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কোন প্রলোভনই তাঁকে ভদ্রতাবোধ থেকে নিরস্ত করতে পারে নি।

তিনি ছিলেন সুকণ্ঠ.। তাঁর ভরাট গলায় সূক্ষ্ম কাজগুলি চমৎকার আসত। আজকালকার গায়ক গায়িকাদের গলায় অতুলপ্রসাদের গান-গুলি অনেক সময় কেমন যেন আদুরে বা ন্যাকামির ভাবে প্রকাশ পায়; কিন্তু অতুলপ্রসাদ দরদী অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠেই গাইতেন। গাইতে গাইতে গানের মধ্যে একেবারে নিমগ্ন হয়ে যেতে পারতেন তিনি—অনেক সময় তাঁর কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ত অশ্রুধারা।

মৃত্যু আসবার পূর্বেই তিনি তার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালের ২৬শে আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়। জীবনের বহু দুঃখ কষ্ট শোক ধীরভাবে সহ্য করে প্রশান্তভাবে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। সব সম্প্রদায়ের আপনার লোক ছিলেন তিনি তাই তাঁর শবাধার বহন করেছিলেন লখনউ-এর হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই একান্ত শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে।

অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। বস্তুত তাঁর গানের স্বরলিপিও প্রকাশ করেছিলেন বিশ্বকবিরই অনুরোধে। কবি-গুরু তাঁর "পরিশেষ" নামক কাব্যগ্রন্থটি অতুলপ্রসাদকে উৎসর্গ করে উপহার দিয়েছিলেন একটি সনেট। আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রসঙ্গের শেষে এই আশীর্বাদটি উদ্ধৃত করি।—

"বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শতস্রোতে রস-বন্যাবেগে
কভু বজ্র বহ্নি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিতে সঙ্গীতে ছন্দে তারি পুঞ্জ মেঘে
বঙ্কিম শশাঙ্ককলা তারি মেঘজটা
চুম্বিয়া মঙ্গলমন্ত্রে রচে স্তরে-স্তরে
সুন্দরের ইন্দ্রজাল ; কত রশ্মিচ্ছটা
প্রত্যূষে দিনের অন্তে রাখে তারি পরে
আলোকের স্পর্শমণি ! আজি পূর্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহস্র বর্ষণ ধারা গিয়াছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিম উত্তরে ;
দিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ
তব জাগরিণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।"

নজরুল

যে কবির মুখরতার একদিন সীমা ছিল না সে কবি আজ মূক। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে দেশবাসীর অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ থেকে আনন্দিত বাণী শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হ'ল না। এ আমাদের পরম ক্ষতি। দত্তাপহারক বিধাতার এই অমোঘ বিধান। একদিন যে প্রকৃতি অকৃপণ হাতে বিতরণ করে আর একদিন সেই আবার নিষ্ঠুর হাতে সবই অপহরণ করে। এমনিই তার রীতি। ভবিতব্যের এই কঠোর নির্দেশ যাঁকে মেনে নিতে হ'ল তিনি নীরবে তা মাথা পেতে নিয়েছেন। এই শ্রান্ত, ক্লান্ত বীরের উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন রইল, আর আমাদের প্রার্থনা যেন দুঃখ বহন করবার শক্তি বিধাতা তাঁকে দেন—পরম মঙ্গলময় যেন শান্তির প্রবাহে তাঁর ক্লেশজর্জর চিত্তকে অভিষিক্ত ক'রে করুণার স্নিগ্ধ স্পর্শ সঞ্চারিত করেন।

নজরুলের জীবনটাই কেটেছে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে—বন্ধনকে তিনি যেন কোনদিনই স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি। আর এই বাঁধভাঙা চলাতেই ছিল তাঁর আনন্দ। সেই উচ্ছল প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের মধ্যে। যেখানে গেছেন সেখানে একটা আচমকা আনন্দের হিল্লোল তুলে দিয়েছেন—সে গানেই হোক, আলাপেই হোক আর বক্তৃতাতেই হোক। এ ছিল তাঁর চিরকালের স্বভাব—সেই ছেলেবেলা থেকে।

১৮৯৯ সালে ২৪শে মে তারিখে তাঁর জন্ম হয় আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। গরীবের ঘরে জন্ম তাঁর। বাল্য কাটিয়ে কৈশোরে পা দেবার আগেই বাবা মারা গেলেন। এই সময় থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই শুরু হ'ল। কিন্তু তা হ'লে কি হয় দারিদ্র্যের আঘাতে তাঁর ললিতকলার প্রতি আসক্তি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। সেই ছেলেবেলা থেকেই পল্লীর নানারকম নাচ-গানের আসরে তিনি গান

লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন। ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তবে পড়াশোনা নিয়মিত হয় নি। মাঝে একজন হিতৈষী তাঁকে মৈমনসিংহের এক গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন পড়াশোনা করবার জন্য কিন্তু সেখানেও তাঁর বেশী দিন মন বসে নি। কিছুকাল বাদে ফিরে এসে রাণীগঞ্জের ইস্কুলে ভর্তি হ'লেন। সেখানে যখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন একদিন সৈন্যদলে ভর্তি হ'য়ে করাচী চ'লে গেলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেটা শেষ পর্যায়। করাচীতে তিনি প্যারসী কবিদের গ্রন্থাদি পড়বার বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলেন। এখান থেকে নানারকমের লেখা তিনি বাঙলা 'পত্রিকাদিতে প্রকাশের জন্য পাঠাতেন।

যুদ্ধ শেষ হ'ল, পল্টন ছেড়ে নজরুল চুরুলিয়ায় ফিরে এলেন। সেখান থেকে চলে এলেন কলকাতায়। এইবারে তিনি গান-বাজনা এবং প্রকৃত সাহিত্যচর্চায় মন দিলেন। বাঙলা ১৩২৮ সালে "মোসলেম ভারত" পত্রিকায় তাঁর যুগান্তকারী কবিতা "বিদ্রোহী" আত্মপ্রকাশ করল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করলেন। অল্প-দিনের মধ্যেই নজরুল সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। সাহিত্যের সঙ্গে সংবাদপত্রেব অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়েছিল। ফজলুল হক সাহেবেব প্রতিষ্ঠিত "নবযুগ" কাগজে তিনি কাজ করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর নিজস্ব পত্রিকা "ধূমকেতু" তো ছিলই। নানারকম উদ্দীপক সাহিত্য সৃষ্টির ফলে সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে তিনি কারারুদ্ধ হ'ন। কারাগারে কর্তৃপক্ষের অন্যায় ব্যবহাবে মর্মাহত হ'য়ে তিনি প্রায়োপ-বেশন শুরু করেন। স্বয়ং কবিগুরু তাঁকে অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ করেন এবং ক্রমে এই উপলক্ষ্যে এক দেশব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অবশেষে চল্লিশ দিন পরে তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন। তিনি যখন জেলে ছিলেন তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বসন্ত" গীতিনাট্যটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। নজরুল তাঁর "সঞ্চিতা" কাব্যগ্রন্থ কবিগুরুকে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯২৪ সালে নজরুল একটি হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করেন।

ক্রমে নজরুলের সঙ্গীত বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠল—গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁকে গান রচনায় নিযুক্ত করলেন। ব্যবসায়ের চাহিদা অনুসারে কবিকে অসংখ্য গান লিখতে হয়েছে—সে সব গানের সঙ্গে পরিচয় আজও আমাদের রয়েছে। বেতার কেন্দ্রের সঙ্গেও একদা তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

কবি প্রথম গভীর শোক পেলেন তাঁর মায়ের মৃত্যুতে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অতি আদরের ছেলে বুলবুল মারা গেল। শোকটা কবির প্রাণে গভীরভাবে বাজল। এই সময়টা তিনি অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন শান্তি পাবার উদ্দেশ্যে।

এর কয়েক বছর পরে তাঁর স্ত্রী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন। বহু চিকিৎসা এবং অর্থব্যয় কবি করেছিলেন, কিন্তু ব্যাধি থেকে স্ত্রীকে মুক্ত করতে পারলেন না। অবিরাম আঘাত এবং আশাভঙ্গের ফলে ১৯৪২ নাগাদ তাঁর মস্তিষ্কে এক দুরারোগ্য জটিল ব্যাধির উৎপত্তি হ'ল। প্রথম দিকে প্রায় কোন চিকিৎসাই হয় নি এবং এক রকম অবহেলার ভিতর দিয়েই কেটে গেল প্রায় আট বছর। তারপর কিছুকাল আগে যখন চিকিৎসার জন্য তাঁকে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হ'ল তখন নানাবিধ পরীক্ষার ফলে দেখা গেল রোগ নিরাময়ের আর বিশেষ কোন আশা নেই। আজ কবি জীবন্মৃত অবস্থায় দিন যাপন করছেন এইটিই আমাদের অশেষ পরিতাপের বিষয়।

নজরুলের সবচেয়ে বড় দাবী তিনি জনপ্রিয় সুরকার। জীবিত-কালে এত জনপ্রিয়তা খুব কম সুরশিল্পীর ভাগ্যেই ঘটেছে। বস্তুত বাংলার সঙ্গীতে নজরুলের যখন অভ্যুদয় হ'ল তখন দেশের জনসাধারণ এই রকম একটি প্রতিভার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। আমাদের দু'জন শ্রেষ্ঠ সুরকার তখনও বর্তমান, একজন রবীন্দ্রনাথ অপরজন অতুল-প্রসাদ। কবিগুরু তখন কতকটা নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। শান্তিনিকেতনে নিভৃতে তিনি যে সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তা কতকটা ছিল জন-সাধারণের নাগালের বাইরে। কবিগুরু তখন তাঁর শিল্পী জীবনের

পরিণতিতে এসে পৌঁছেছেন—সে সময় তাঁর সৃষ্টির স্বকীয়তা এবং গভীরতাকে উপলব্ধি করবার মত ক্ষমতা সাধারণের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিরই ছিল। ওদিকে অতুলপ্রসাদ রয়েছেন সুদূর লখনউ-এ। তিনিও উপস্থিত হয়েছেন শিল্পী জীবনের পরিণত অবস্থায়। গজল, লাউনী, কাজরী, দাদরা, বিবিধ ঠুংরী এবং টপ্পাভঙ্গিম গানে তিনি তখন বিশেষভাবে খ্যাত। কিন্তু তাঁর রচনায় দখল পাওয়াও সহজ ব্যাপার নয় কেননা তার গভীরতাও অনন্যসাধারণ। কিন্তু তাঁর রচনা সংখ্যার দিক দিয়ে স্বল্প আর তিনি ছিলেন বাঙলা থেকে বহু দূরে। সুতরাং বাঙলায় সঙ্গীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগ তাঁর ছিল না। উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে এই সময়ে বাঙলায় সাধারণ্যে প্রচলিত সঙ্গীত এক গতানুগতিক নিয়মে চলেছিল এবং তাঁর অধোগতিও সূচিত হয়েছিল খানিকটা—এমন সময় বিচিত্র সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হলেন নজরুল ইসলাম। সেই বৈচিত্র্য, নূতনত্ব এবং রচনায় সারল্য সকলেবই হৃদয়-গ্রাহী হ'ল নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে।

নজরুলের রচনা যেমন বিপুল তেমনি তাঁর প্রতিভাও বহুমুখী। শুধু উদ্দীপনাময় স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেই যে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন তা নয়, সঙ্গীতের বিবিধ কলাকৌশল নিয়েও তিনি পরীক্ষা করেছেন প্রচুব, আর সেই সমস্ত পরীক্ষাই জনসাধারণের রুচির সঙ্গে মিলিয়ে করেছেন। আমাদের কাব্যসঙ্গীতে এইখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

অনেক গান তিনি রচনা কবেছেন গজলের ঢঙে—তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে যেমন ঠুংরির আমেজ, কার্ফার ছন্দ-চটুলত্ব, গজলের কতকগুলি বিশিষ্ট ভঙ্গি। এই ধরনের গানের মধ্যে "কেউ ভোলে না কেউ ভোলে", "এ আঁখিজল মোছ পিয়া", "বসিয়া বিজনে কেন একা মনে" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কার্ফার সঙ্গে আবার কোন কোন সময় দাদরাও মিশিয়েছেন—"ফাগুন রাতের ফুলের নেশায়" গানটি এর একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। এ ছাড়া বাংলা

গজল, দাদ্‌রায় "শেয়র্"-এর ভঙ্গিটিও বোধ হয় নজরুলই প্রথম আনেন।

বিভিন্ন ধরনের দাদরায় নজরুল বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। দাদরায় তাঁর বহু গান আছে,—এর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গান হ'ল—"রুমু ঝুমু রুমু ঝুমু কে এলে নূপুর পায়", "মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর", "মেঘের হিন্দোলা", "দাঁড়ালে দুয়ারে মোর", "পানসে জোছনাতে", ঠুংরী দাদরায়—"কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী", "সখি বোলো বঁধুয়ারে।" "রুমু ঝুমু রুমু ঝুমু" গানটিতে একটি চমৎকার নৃত্যভঙ্গী ফুটে উঠেছে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য বাংলা গানে কমই দেখা যায়। "মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর" গানটিও একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সৃষ্টি। কাব্য-মাধুর্যের সঙ্গে সুরের একটি মনোহর গতি গানটিকে একটি অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্য প্রদান করেছে। ঠুংরি দাদরার দিক থেকে "কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী" একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। অতুলপ্রসাদের পর এই ধরনের গানে একমাত্র নজরুল সার্থকতা লাভ করেছেন।

এ সব ছাড়া বিদেশী ঢংও কয়েকটি গানে তিনি আনতে চেষ্টা করেছিলেন। "শুকনো পাতার নূপুর পায়ে" গানটি এই ধরনের একটি সার্থক রচনা। গানটির সুর এক প্রকার আরবী সুর থেকে নেওয়া এবং তাল কাহারবা। ছন্দ এবং সুর বৈচিত্র্যের দিক থেকে আমাদের কাব্য সঙ্গীতে এটিও অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। গানটির সুরে যেন মরুভূমির ঘূর্ণী হাওয়ার চঞ্চলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং ছন্দে যেন তার নাচন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রতি কলির শেষে কাহারবা ছন্দে "জল তরঙ্গে ঝিল্ মিল্ ঝিল্ মিল্ ঢেউ তুলে সে যায়" এই ধুয়াটিতেও যেন একটা নৃত্যের হিল্লোল প্রবাহিত হয়।

লোক-সঙ্গীতের ঢঙে কয়েকটি রচনাতেও নজরুল বেশ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এর মধ্যে "আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল" গানটি বিশেষ-

ভাবে উল্লেখযোগ্য। এমন মধুর বাউল ঢঙের গান খুব কমই পাওয়া যায়। এর সঞ্চারী অংশটিও ভারি স্নিগ্ধ।

"ভুলায়নি আমারি কূল
ভুলেছে নিজেও সে কূল
ভুলে বৃন্দাবন গোকুল
মোর সাথে মিলন বিরহ"

উদারার ধৈবত ছোঁয়া আরম্ভটি থেকে নিয়ে সুরের কোমল সঞ্চরণে যেন এই অংশটি মন ভোলানো আবেশের সৃষ্টি করেছে।

নজরুলের উদ্দীপক সঙ্গীতের অনেক সুর সম্ভবত হারিয়ে গেছে। "কারার ঐ লৌহ কপাট", "আজি রক্ত নিশি ভোরে", "এই শিকল পরা ছল মোদের" প্রভৃতি গানগুলি খুব অল্প লোকই জানেন। বিশেষ করে "শিকল পরা ছল মোদের" গানটির সুর নানা কারণেই রক্ষিত হওয়া উচিত। কারাবাসে এটি কবির অতি প্রিয় গান ছিল। ইংরাজ সরকার কবির হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি দিয়ে কবিকে যখন নির্জন কক্ষে বন্দি করে রেখেছিলেন তখন তিনি এই গানটি রচনা করে গিয়েছিলেন।—

এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবে রে বিকল!
তোমার বন্দী কারায় আসা মোদের বন্দী হ'তে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়,
এই বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করব মোরা জয়,
এই শিকল বাঁধা পা' নয় এ শিকল ভাঙা কল।

এই রকম আরো অনেক স্বদেশী সঙ্গীতের সুর লিপিবদ্ধ করা নেই। অচিরে এই সব গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হওয়া দরকার। এখনও অনেকে রয়েছেন যাঁরা নজরুলের অনেক গানের সুর জানেন। এ সব

সুর যদি এখন ধরে রাখা না যায় তবে ভবিষ্যতে আর পাবার উপায় থাকবে না।

শেষ জীবনে কবি লুপ্ত রাগসঙ্গীতের পুনরুদ্ধারকল্পে কিছু কিছু গান রচনা করেছিলেন সেগুলিরও অনেক স্বরলিপি বেরোয় নি। রাগ-সঙ্গীতকে আশ্রয় ক'রে নজরুল যে সব গান রচনা করেছেন অনেক দিক দিয়ে তার মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে—এই কারণেই তাঁর এই সব গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে সত্যভাষণের খাতিরে একটি কথা বলতে হবে। নজরুল-সাহিত্য ও সঙ্গীতের অনুরাগী কোন লেখক সুরকার হিসাবে নজরুলকে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অতুলপ্রসাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। এমন কি তাঁর মতে স্বদেশী গান রচনায় নজরুলের কৃতিত্ব কোন কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথেরও ওপরে। নজরুলের অত্যন্ত অনুরাগী হয়েও এই ধরনের মন্তব্যকে গ্রহণ করতে আমার প্রবল আপত্তি আছে। রবীন্দ্র-নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অতুলপ্রসাদ আমাদের বর্তমান কাব্যসঙ্গীতকে গড়ে তুলেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। সুরের বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা, গভীরত্ব কোন দিক দিয়েই নজরুলের প্রতিভা এঁদের সঙ্গে সমকক্ষতা দাবী করতে পারে না। বস্তুত, এঁদের গড়া সঙ্গীতেই নজরুল বৈচিত্র্য আনবার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছিলেন। এই দিক থেকেই তাঁকে আমরা একজন বিচিত্র স্রষ্টা বলে অভিনন্দিত করি এবং তাঁর রচনার ভূয়সী প্রশংসা করি। কিন্তু স্তুতির আতিশয্যে একজনকে প্রাপ্য গৌরব থেকে বঞ্চিত ক'রে অপরকে সমধিক গৌরবান্বিত করার প্রচেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয়। সমালোচনার প্রকৃত মূল্যই অকুণ্ঠ সত্যভাষণে নতুবা তাকে সমালোচনা বলব না, তা স্তুতিবাদেরই নামান্তর।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশে সঙ্গীতে মুক্ত-দৃষ্টিসম্পন্ন যে সঙ্গীতাচার্যের কথা আজ আমরা স্মরণ করছি তাঁর নাম কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ফাল্গুন মাসেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৪৬ সালে এবং ফাল্গুন মাসেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৯০৪ সালে। সঙ্গীতের জন্য তখনকার দিনে সরকারী উচ্চপদ তিনি ছেড়েছিলেন—বহু অসুবিধা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল নানাভাবে এবং নানাকারণে মনোকষ্টও তিনি কম পান নি। কুচবিহারের রাজার আনুকুল্যে 'গীতসূত্রসার' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত করে তিনি তাঁর সঙ্গীত-জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ মতবাদ প্রচার করে গেছেন এবং এই একখানি গ্রন্থই তাঁকে আমাদের সঙ্গীত-জগতে অমর করে রেখেছে।

সঙ্গীত-সাহিত্য বলে যে একটা কিছু গঠিত হতে পাবে বা সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা আলোচনার অবতারণা করবার সুযোগ আছে আমাদের সঙ্গীত জগতে সেরকম ভাবে ভেবে দেখবার অবকাশ তখন খুব কম লোকেরই ছিল। গীতসূত্রসারের আগে দু'একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ যে বেরোয়নি তা নয়, দু-একরকমের স্বরলিপিও উদ্ভাবিত হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গীতে এমন অন্তর্দৃষ্টি, এমন দূরদর্শিতা এবং এমন বিশ্লেষণভঙ্গীর পরিচয় ইতিপূর্বে আর পাওয়া যায় নি। আজ থেকে সত্তর বৎসরেরও আগে তিনি আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে যেসব সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে গেছেন, যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন আজ তা বহুলাংশে সফল হয়েছে। কতখানি ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম চিন্তাধারার পরিচয় বহন কবছে এই গ্রন্থখানি তা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করলে বোঝা যায় এবং আশ্চর্য হতে হয়।

কৃষ্ণধনবাবু সবচেয়ে দাগা পেয়েছিলেন যখন ইউরোপীয় রৈখিক রীতিতে রচিত তাঁর স্বরলিপি তেমন প্রচার লাভ করল না এবং ইতিমধ্যে আকারমাত্রিক স্বরলিপি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে

বসল। এ নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ বড় কম হয় নি। এক সময় অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এক পত্রে লিখলেন—"আমি এক সময় সঙ্গীতে পাগল হইয়াছিলাম। সঙ্গীত-চর্চার জন্য উপযুক্ত সাবকাশ পাইতাম না বলিয়া আমি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, যে পদ এখন লোকে মাথা খুঁড়িয়াও পায় না। আমি সে পদে *থাকিলে এখন ৫।৬ শ' টাকার গ্রেডে উঠিতাম। এখন আমার তজ্জন্য* মহা আপসোস হয়। আমার একূল ওকূল দু'কূল গিয়াছে।" কিন্তু এর জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে খুব দায়ী ছিলেন তা নয়, আমাদের দেশ ইংরেজি staff notation-এর পদ্ধতিতে স্বরলিপি গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং আকার-মাত্রিক অনেক সহজ বলে সেটা অনায়াসেই গৃহীত হয়েছে। তবে আজকের সাঙ্গীতিক প্রগতি দেখে মনে হয়, কৃষ্ণধনবাবুর প্রদর্শিত রৈখিক স্বরলিপিও এই সঙ্গে প্রচলিত হলে ভালই হতো—বিশ্বের একটা সর্বজনীন সঙ্গীত লিখন প্রণালীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকত। এই স্বরলিপির প্রচারে উৎসাহ দেওয়া উচিত ছিল বৈকি। কিন্তু কৃষ্ণধনবাবু যুগের কিছু আগেই এগিয়ে চলেছিলেন। প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদের অতিরিক্ত উৎসাহ অনেক সময় শেষ পর্যন্ত নিরুৎসাহের কারণ হয় ইতিহাস তার বহু সাক্ষ্য বহন করছে।

আজ বাংলা গানের নানাদিকে কত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে কিন্তু সেযুগে বিশেষ করে ১৮৮৫ সালেরও খানিকটা আগে সে সম্ভাবনা দেখা দেয় নি। কৃষ্ণধনবাবু এই বিপুল সম্ভাবনার উল্লেখ করেছেন—বাংলায় ভাল খেয়াল ধ্রুপদ রচনা হ'তে পারে নি এটা তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। সেযুগে এই অভাবের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,—"খেয়াল ও ধ্রুপদীয় সুরে ঈশ্বর বিষয়ক ব্যতীত, অন্যান্য উত্তম বিষয়ক বাঙ্গলা গান নাই বলিলেই হয়; এই একটা আমাদের বৃহৎ অভাব রহিয়াছে। এইজন্য এতদিনেও খেয়াল ধ্রুপদ বাঙ্গালীর জাতীয় সঙ্গীত হইতে পারে নাই। অতএব আমাদের বাঙ্গালী কবি ও কলাবৎ উভয়ে

একত্র হইয়া ঐ সকল সুরে সর্বদা ব্যবহার্য নানা বিষয়ে উত্তমোত্তম বাঙ্গলা গীত রচনা করা উচিত; তাহা হইলে ঐ সকল সুরের প্রতি সর্বসাধারণের আস্থা ও প্রবৃত্তি হইয়া শীঘ্রই দেশময় বিশুদ্ধ সঙ্গীত জ্ঞানের বিস্তার-নিবন্ধন জাতীয় সভ্যতার উন্নতি হইবে।" এই সঙ্গে তিনি বাংলার কাব্যসঙ্গীতের উন্নতির কথাও তুলেছিলেন কিন্তু গীত-সূত্রসার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গ্রন্থ অতএব তা'তে এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর হওয়া তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বহু হিন্দী গান থেকে বাংলা গান রচনা করে এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করেছিলেন।

ঠুংরী যখন সবেমাত্র প্রাধান্যলাভ করতে আরম্ভ করেছে কিন্তু ওস্তাদদের কাছ থেকে আমল পাচ্ছে না, তখন কৃষ্ণধনবাবু ঠুংরীর বৈচিত্র্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধভাবে আলোচনা করে গেছেন। কাব্যসঙ্গীতে বিশুদ্ধ রাগের প্রাধান্য অবশ্য তাঁর কাম্য ছিল কিন্তু যেখানে তিনি রাগমিশ্রণে বৈচিত্র্য দেখেছেন সেখানে সেই প্রয়াসের অকুণ্ঠিত প্রশংসা করেছেন। তখনকার মিশ্র সুরের বাংলা গান সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "ঠুংরীর সুরে বিচিত্রতার তাৎপর্য এই যে, ইহার কলেবর যেরূপ সংক্ষেপ তাহার তুলনায় ইহাতে বিচিত্রতা অধিক। সেই বিচিত্রতাকে চলিত কথায় "জঙ্গ্‌লা" বলে, অর্থাৎ এক গানের একই কলিতে দুই তিন রাগের সংযোগ। এরূপ আশ্চর্য কৌশলে এই যোগ সম্পাদিত হয় যে, তজ্জন্য উহা অসঙ্গত শুনায় না; একখানি সুরের ন্যায়ই বোধ হয়। ইহাতে সচরাচর খাম্বাজের সহিত ভৈরবী, কিংবা সিন্ধু পিলু, লুম অথবা বেহাগ, এই প্রকার রাগের সংযোগ দেখা যায়। ঐ ভৈরবীর অংশ এমন সকল স্থানে প্রয়োগ করা হয় যেখানে খাম্বাজের ঠাটেই ভৈরবীর কোমল ঠাট প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন গানে এক রাগিণীতেই কোন নূতন কড়ি কোমল প্রয়োগ করত খরজ পরিবর্তন দ্বারা বিচিত্রতা সম্পাদন হয়।····· সংক্ষেপের মধ্যে এই প্রকার বিচিত্রতা নিষ্পন্ন হওয়াতেই উহা সাধারণের

মনোরঞ্জক হয়।" এই জংলা ঢংএর গানই আমাদের কাব্যসঙ্গীতের একটি ধারার আদিরূপ। যেমন নিধুবাবুর গানকে অবলম্বন করে মূলত আমাদের কাব্যসঙ্গীত সংগঠিত হয়েছে তেমনি জংলা ঢংএ আড়-খেমটা, দাদরা, কাহারবা তালে এক শ্রেণীর গানের উদ্ভব হয়েছিল যার পরিমাণ সামান্য নয়। বস্তুত আমাদের গানে আড়-খেমটা রীতির প্রচলন একটা গবেষণার বিষয়। গত শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত অনেক গান আড়-খেমটায় গাওয়া হ'ত যেগুলি সুর এবং সাহিত্যসম্পদে বিশেষ মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথও এই ঢংএ বহু গান রচনা করেছেন। গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় এই ধরনের অনেক গান প্রচলিত হয়ে এক সময় বাংলা গানে এই ষ্টাইলের একটা প্রেরণা এনে দিয়েছিল। অথচ কৃষ্ণধনবাবু যে যুগে এই রীতির বৈচিত্র্যের উল্লেখ করেছেন তখন এইসব গান সাধারণের অনুমোদন পেলেও শিক্ষিত নীতিবাদীরা এদের পরম ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করতেন এবং ওস্তাদবর্গও পরম অবহেলায় বর্জন করতেন। সেযুগের পক্ষে এই মুক্তদৃষ্টি এবং ঔদার্য কম সাহসিকতার পরিচয় নয়।

অপরাপর বহু বিষয়ের মতো গলা সাধা সম্পর্কেও তিনি সেযুগে সম্পূর্ণ নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেই ওস্তাদিয়ানার যুগে অসায়াসেই তিনি তানপুরার ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে বল্লেন—"বহুকাল হইতেই তাম্বুরা লইয়া গান করার প্রথা বদ্ধমূল হওয়াতে এবং তাম্বুরা ব্যতীত গানের সাহায্যকারী অন্য উত্তমতর যন্ত্র না থাকাতে ওস্তাদেরা তাম্বুরার অনুরোধে কণ্ঠস্বরেও জোআরী করিয়া বাজখাঁই ধরন সাধনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, তাম্বুরা যন্ত্রই যত অনিষ্টের মূল; অতএব উহার সহিত আওয়াজ সাধা কখনই উচিত নয়। সাধনা দ্বারা কণ্ঠস্বর মিষ্ট করিতে হইলে হার্মোনিয়ম যন্ত্রের সহিত সাধিয়া, উহার আওয়াজ কণ্ঠে অনুকরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত; তাহা হইলে কণ্ঠ অতিশয় সুমধুর হইবে। কিন্তু হার্মোনিয়ম কিছু মূল্যবান যন্ত্র; সকলের আয়ত্তাধীন নহে। এস্রার, বেয়ালা,

সারঙ্গী, ইহাদের সহিতও আওয়াজ সাধিলে কণ্ঠ সুললিত হইতে পারে। কিন্তু তাম্বুরা অতি অনায়াসলভ্য যন্ত্র; সকলেই কিনিতে পারে। অতএব তাহার সহিত কণ্ঠ সাধন করিতে হইলে এই উপদেশ গ্রহণ করা উচিত যে, তাহাতে জোআরী না দিয়া তাহার স্বাভাবিক ধ্বনির সহিত স্বর সাধনা করিবে; তাহা হইলে কণ্ঠে জোআরী জন্মিবে না।" এই মতবাদের স্বপক্ষে বিপক্ষে বহুবিধ মন্তব্য হতে পারে এবং ইতিপূর্বে রেডিও যখন হার্মোনিয়ম বন্ধ করলেন তখন এই বিষয়েই অনেক লেখালেখি হয়েছেও; কিন্তু কৃষ্ণধনবাবু যা বলেছেন তা অসঙ্গত নয়। হার্মোনিয়মকে সর্বাংশে গ্রহণ করতে তিনি বলেন নি; কেননা, ভারতীয় গানে সম্পূর্ণ রস বজায় রেখে হার্মোনিয়মের সঙ্গে গাওয়া যায় না একথা তিনিও স্বীকার করেছেন—কিন্তু হার্মোনিয়ম অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গঠিত—এই হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে হার্মোনিয়মের পর্দার সঙ্গে স্বর সাধন করা যুক্তিযুক্ত, এটাই ছিল তাঁর অভিমত। হাল আমলে বেতার কর্তৃপক্ষ হার্মোনিয়ম বয়কট করেছেন, দেখাদেখি আরো অনেকে ছেড়েছেন, কিন্তু তানপুরা বা এস্রাজটা সুরে বেঁধে নেবার জন্য আবার একটা হার্মোনিয়ম রেখে দিতেও তো দেখেছি সব জায়গাতেই। হার্মোনিয়ম যদি অতই বেসুরো তবে "সা" আর "পা"টা ঠিক করবার জন্য ঐ যন্তরটার এত দরকারই বা হয় কেন? কৃষ্ণধনবাবু ঠিকই ধরেছিলেন। ভাল হার্মোনিয়মের পর্দা বিজ্ঞানসম্মতভাবেই বাঁধা হয় সুতরাং প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে হার্মোনিয়মে স্বরসাধনাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। আর সূক্ষ্মশ্রুতির ব্যাপার সে অনেক দূরের কথা—সেটা ওস্তাদদের মধ্যেই কজন যে ঠিক ফোটাতে প্যারেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

সমালোচক হিসাবে কৃষ্ণধনবাবু যে বিশেষ শ্রদ্ধেয় তার একটা কারণ সঙ্গীতে কুসংস্কার এবং গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি স্পষ্টভাষায় অভিমত প্রকাশ করেছেন। গীতসূত্রসার গ্রন্থে সঙ্গীতের রসবিচার প্রসঙ্গে তাঁর নির্ভীক উক্তি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। সঙ্গীতে মিশ্রণের

উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি লিখেছেন—"কুসংস্কার এবং গোঁড়ামি যেমন সকল বিষয়েই উন্নতির পরম শত্রু সঙ্গীতেও ততোধিক। উন্নতি প্রতিরোধক কুসংস্কার-নিবন্ধন সঙ্গীত-নিপুণ লোকদিগের নূতন সুর রচনার প্রতিভা প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই। ক্ষমতার উদয় হইলে আপনা হইতেই উক্ত অযুক্ত প্রথা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে তাহার সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে অন্যান্য বিষয়ের সহিত সঙ্গীত বিষয়েও লোকের স্বাধীনতা থাকাতে, এতদ্দেশে অনেক প্রকার নূতন সুরের ও তালের উদ্ভব হইয়াছিল ; কীর্তন তাহার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। ইদানীং হিন্দুস্থানী সঙ্গীত প্রবিষ্ট হইয়া সেই স্বাধীনতা ক্রমে দূর করিতেছে। এটি যে অমঙ্গলের বিষয়, তাহা কলাবংগণ কখনই স্বীকার করিবেন না। কিন্তু বাস্তবিক সেই জন্যই নাট্যাভিনয়ে ও যাত্রায় সঙ্গীতের ব্যাপার ক্রমেই অতীব শোচনীয় ও জঘন্য হইয়া উঠিতেছে। এরূপও অনেকে তর্ক করেন যে, আমাদের এতপ্রকার রাগ ছিল ও এখনও আছে যে, যে কোন নূতন স্বরবিন্যাস বলিবে, তাহা কোন না কোন এক রাগের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যায়। ইহা নিতান্তই অত্যুক্তি। বঙ্গদেশে এমন অনেক সুর আছে যাহাতে রাগরাগিণীর কোন গন্ধ নাই। পৃথিবী এত পুরাতন হইয়াছে যে, নূতন আর কিছুই হইতে পারে না, ইহা একদল তার্কিকের মত বটে, কিন্তু প্রত্যেক নূতন রচনার সময়েই কি লোকে পুরাতন রচনার নকল করে ? যাহার ক্ষমতা থাকে, সে নূতন সৃষ্টি অক্লেশে করে। কিন্তু সে ক্ষমতা সকলের হয় না ; এইজন্যই নূতন রচনার এত প্রশংসা।"

কৃষ্ণধনবাবু এই উক্তি করেছিলেন আজ থেকে সত্তর বৎসরেরও আগে। তাঁর সেই আশা বাংলার কাব্যসঙ্গীতে নব নব সৃষ্টিতে আজ সফল হয়ে উঠেছে বাংলার শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীত সমালোচককে স্মরণ করে, এইটে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি এবং আজও বাংলা গান যাঁরা গাইছেন তাঁদের এই বাণীটি আবার স্মরণ করিয়ে তাঁদের প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার করতে পারি।

সুরসাগর হিমাংশুকুমার

"বরষার মেঘ নামে ঝর বরিষণে"—নববরষার বর্ষণসিক্ত অপরাহ্ণে মনে গুনগুনিয়ে উঠছে মিয়ামল্লারের করুণ মীড। যিনি সুর দিয়েছিলেন তিনি আজ আর নেই—এ গান যাঁর লেখা তিনিও আজ পরলোকে। সুরসাগর হিমাংশুকুমার এবং গীতকার অজয়কুমাব দুজনেই অকালে ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন।

এই করুণ সুরের কোমল কোরক প্রথম প্রস্ফুটিত হয়েছিল বাংলার পূর্ব প্রান্তে ত্রিপুবা জেলার কুমিল্লা শহরে। এই শহরেই মানুষ হয়েছেন ত্রিপুরার রাজবংশের সন্তান শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মণ যিনি উত্তরকালে হিমাংশুকুমারের সুরকে কণ্ঠে রূপায়িত করেছেন। কবি অজয়কুমারেব নিবাসও ছিল এই কুমিল্লাতেই। এই ত্রয়ীব সম্মেলনে আমাদের বাংলা গান বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

হিমাংশুকুমারের কৈশোরের সঙ্গে যিনি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিলেন তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট গীতকার শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ। একজন গান রচনা করতেন আর একজন সুর দিতেন। এইভাবে দিনের পর দিন কেটেছে এঁদের গানের নেশায়। হিমাংশুকুমারের অতি প্রিয় গান—"ডাক দিয়ে যায় কেগো আমায় বাজিয়ে বাঁশি"—সুবোধবাবুর লেখা। আরও কত গান তাঁর পবে বিখ্যাত হয়েছে—"খুঁজে দেখা পাইনে যাহার", "তব স্মরণখানি", "আবেশ আমার যায় উড়ে কোন ফাল্গুনে" —ইত্যাদি। মাঝে মাঝে কুমিল্লায় আসতেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী। হিমাংশুকুমার তাঁব কাছ থেকে "ভজন" গাইবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। কুমিল্লায় এক ধর্মমন্দিরে তিনি এইসব ভজনাদি গাইতেন। এইসব গানের একটি প্রভাবও তাঁর মনে স্থায়ী হয়েছিল যার ফলে তাঁর স্বভাবে সাত্বিকতাই প্রাধান্যলাভ করেছিল।

তাঁর পিতার উৎসাহও ছিল এ বিষয়ে প্রচুর। হিমাংশুকুমারের

সুর দেওয়া গান শোনবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে বহু পরিচিত ব্যক্তিকে আহ্বান করতেন এবং শুধু গান নয়, প্রচুর জলযোগেও তাঁদের পরিতৃপ্ত করতেন। কুমিল্লার অধিবাসীদের মধ্যে আজও অনেকে সে সব কথা স্মরণ ক'রে আনন্দিত হন। এই প্রসঙ্গে এটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর মা ছিলেন সুগায়িকা এবং তাঁর কাছ থেকেই সঙ্গীতের প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি খুব অল্প বয়স থেকে।

গান নিয়ে থাকলেও পড়াশোনায় হিমাংশুকুমার অবহেলা করেন নি। ১৯২৪ সালে কুমিল্লা জেলা ইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯২৬ সালে আই. এস-সি পরীক্ষায় তিনি উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। এই সময়ে কিছুকাল তাঁর পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটলেও পড়া ছাড়েন নি, বি. এ. পাশ করেছিলেন।

ধীরে ধীরে কলকাতায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বহু অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত সমাজের আমন্ত্রণে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। গম্ভীর প্রকৃতির এই যুবকটিকে কিন্তু কোন তরল জলসায় বা বৈঠকে খুঁজে পাওয়া যেত না। সুরের গভীরতা যেমন তিনি পছন্দ করিতন তেমনি ছিল তাঁর পরিচিতের পরিধি। স্বল্প এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহচর্য তিনি পছন্দ করতেন—হাল্কা অনেকের মেলায় চটুল পরিবেশ নয়। যাঁরাই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তাঁরাই তাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য। এই কারণেই ব্যবসায়ী সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েও তিনি কোনদিন অগভীর সুর রচনা করেন নি জনপ্রিয়তা লাভের উদ্দেশ্যে। হয়তো কম সুর রচনা করেছেন কিন্তু যেটুকু করেছেন সেটুকু লাভ করেছেন গভীর উপলব্ধি থেকে। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের কয়েকটি ভঙ্গী তিনি তাঁর সুরে যুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে প্রচেষ্টা আজকের সিনেমার প্রচেষ্টা নয় সেখানেও মীড়ের চমৎকার গভীর কাজগুলি আমাদের সঙ্গীতে আনবার দিকে ছিল তাঁর লক্ষ্য। স্বরজ্ঞান ছিল তাঁর খুব প্রখর। বাল্যকাল থেকে তিনি স্বর-

লিপির চর্চা করেছেন। স্বরলিপিতে একবার চোখ বুলিয়ে অনায়াসে গেয়ে যাওয়া ছিল তাঁর অভ্যাস। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপির প্রতিটি গ্রন্থ ছিল তাঁর প্রিয়, তাছাড়া ভাতখণ্ডের স্বরলিপি থেকেও তিনি বহু সুরের উৎস খুঁজে পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত এটিও উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষ প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল। তাঁর সুরে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রীতিতে তিনি গানের চারটি কলিকে রূপায়িত করতেন, বিশেষ করে সঞ্চারীটি, স্বরলিপির এই অভ্যাসটিও রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুশীলন থেকেই তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল।

কলকাতায় এসে তাঁর পরিধি ব্যাপক হ'লেও ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে সঙ্গীত রচনার বিরাম ছিল না। কলেজের অবকাশে কুমিল্লায় ফিরে গিয়ে তিনি নানা গানের সুর দিয়েছেন। এই সময় অজয়কুমার গান লিখতে আরম্ভ করেন এবং তা'তে হিমাংশুকুমার সুর সংযোগ করতেন। এইসব গানের স্মৃতি এখনও আমাদের মনে বিশেষ উজ্জ্বল সুতরাং উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। "মম মন্দিরে", "আলোছায়া দোলা", "তুমি তো বঁধু জান" প্রভৃতি গান সুরসৃষ্টির অপূর্ব উদাহরণ। আরও অনেকের গানে সুর দিয়েছেন হিমাংশুকুমার। এর মধ্যে শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় রচিত গানগুলি সঙ্গীতের দিক দিয়ে বিশেষ মূল্যবান। "নতুন ফাগুন যবে"—এই বিখ্যাত গানটি এঁরই রচনা।

এই সুগভীর সুরসৃষ্টির জন্য ভাটপাড়া থেকে তাঁকে "সুরসাগর" আখ্যায় ভূষিত করা হয়। সম্ভবত ১৯৩১ সালে তিনি এই সম্মান প্রাপ্ত হন। এই পরিচয়েই তিনি বিশেষ খ্যাত। বস্তুত "সুরসাগর" বললে একমাত্র হিমাংশুকুমারের নামই আমাদের মনে পড়ে।

হিমাংশুকুমারের চরিত্রের আর একটি দিক ছিল পুরোপুরি "রোমান্টিক"। আর এই স্বপ্নরঙীন মন ছিল অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর এবং অভিমানী। যা তিনি চেয়েছেন তা পান নি। তাঁর স্বপ্নের প্রত্যাশা সফল হয় নি। এই না পাওয়ার বেদনা তাঁর শেষ জীবনের

কত গানের গভীর মীড়ে সুগভীর করুণ চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে। সে মীড় শান্ত, উদাস অথচ স্নিগ্ধ। যৌবনের যে দিনগুলি তাঁর রসোচ্ছলতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারত তা নিরাশার তপ্তশ্বাসে দগ্ধ হয়ে বিলীন হয়ে গেল। এই মানসিক দ্বন্দ্ব এবং জ্বালাকে তিনি কতভাবে এড়াতে চেয়েছেন। উদাসীর গৈরিক চিহ্ন ছিল তাঁর প্রিয়। গৈরিক সজ্জায় তিনি তৃপ্তি পেতেন। শুনেছি একদা গৈরিক পরিহিত দুই ব্যক্তি স্বামী অভেদানন্দের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক উপদেশে অন্তরকে শীতল করবার উদ্দেশ্যে। একজন নজরুল অপরজন হিমাংশু-কুমার। স্বামীজী মধুর সম্ভাষণে তাঁদের পরিতৃপ্ত করে সন্ন্যাসজীবন থেকে নিবৃত্ত করেন।

অবশেষে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ এই বেদনার সমস্ত ক্লান্তি নিঃশেষে মুছে দিল। সুরসাগরের জীবনাবসান হয় ১৯৪৪ সালের পনেরোই নভেম্বর। তখন তিনি সবেমাত্র যৌবনের পূর্ণতায় পৌঁছেছেন।

হিমাংশুকুমারের সুরের মূল রসটি হচ্ছে করুণ রস। এই করুণ রস বাংলা গানে কত ভাবে কত ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়ে এসেছে। কীর্তনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য করুণ রস, টপ্পা তো করুণ রসকেই আশ্রয় করে আছে। কিন্তু হিমাংশুকুমার বেছে নিয়েছেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য মীড়ে এবং ছোট ছোট অলঙ্কারে। এই অপূর্ব মীড়গুলির বিশিষ্ট উদাহরণ হচ্ছে "ঝরা চামেলী বনে" গানটি। কত সূক্ষ্ম কাজ এবং সৌন্দর্য যে এই গানটিতে আছে তা লিখে বোঝাবার নয়। গানটির অন্তরায় এবং আভোগে মধ্যম থেকে ধৈবত এবং পুনরুক্তির সময় মধ্যম থেকে তারসপ্তকে কোমল মীড়ের সঞ্চরণ মনে যেন একটা বিষাদের রেখা টেনে দেয়। সঞ্চারীতে দুটি গান্ধারের প্রয়োগে একটি ব্যথাতুর আন্দোলন মনকে দোলা দেয়; আর ছোট ছোট কাজ যেমন 'গমপমগমা', 'নর্সর্র্সর্নর্সা', 'ধণর্সণধণা'—যেন ব্যথার তারে এক একটি ঝঙ্কার তোলে। এই কাজগুলিই হিমাংশুকুমারের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি।

যে সময়ে তিনি ব্যাপকভাবে সুর দিয়েছেন সেই সময়টা বাংলা গানের একটা চলন্ত যুগ। গ্রামোফোনের নানা শ্রেণীর রেকর্ডই হচ্ছে তখন লোকের আদর্শ। খেলো গজল, চটুল ঠুংরী, ভাটিয়ালি, হাল্কা দাদ্রা—এই সবই ছিল তখন বিশেষ জনপ্রিয়। হিমাংশুকুমার এই বৃথা বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হন নি। তাঁর রুচির বিকৃতি কখনো ঘটে নি বিবিধ রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও। এইসব কারণেই অব্যবহিত পূর্ব যুগের বহু গান আজ বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে কিন্তু হিমাংশু-কুমার তাঁর গৌরব রক্ষা করেছেন এবং তাঁর সুরের সৌন্দর্য বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হিমাংশুকুমারের সুর রচনা বলতে গেলে রাগসঙ্গীতের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বৈচিত্র্য অনেক ক্ষেত্রে রাগসঙ্গীতের কারুকলার বিচিত্র প্রয়োগে নতুন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। স্পর্শ স্বর তিনি খুব বেশি ব্যবহার করতেন এবং প্রথাগত স্বরের জোড়গুলি পরিহার করে অনেক সময় সুরের মিশ্রণ আনতেন অস্বাভাবিকভাবে। এই প্রচেষ্টাই তাঁকে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের দিকে মনোযোগী ক'রে তুলেছিল। অনেক সময়ে রাগসঙ্গীতের স্বাভাবিক ভঙ্গি থেকে তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে ফিরে যেতেন। যেমন "নতুন ফাগুন যবে" গানটির অন্তরা এবং আভোগ—স্বাভাবিকভাবেই মধ্যম থেকে তারসপ্তকে এই অংশের সুর উঠেছে কিন্তু শেষ হ'ল তাঁর নিজস্ব বিচিত্র ভঙ্গীতে। "আলো ছায়া দোলা" আর একটি বিচিত্র সুরসৃষ্টি। বাহারের সব লক্ষণই এতে আছে, রাগসঙ্গীতের বিশিষ্ট ভঙ্গিরও পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছে হিমাংশুকুমারের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এইখানেই তাঁর প্রকৃত গুণপনার পরিচয়।

এই রাগমিশ্রণ এবং স্বরের বিচিত্র প্রয়োগের মূলে রয়েছে হিমাংশু-কুমারের গভীর উপলব্ধি। জীবনের তীব্র অনুভূতিকে তিনি সুরে ব্যক্ত করেছেন—এইখানেই তিনি মামুলি সুরকারের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। এই যে প্রকাশ, এর জন্য তিনি যে রীতি বেছে নিয়েছেন তাও

মামুলি পন্থা থেকে স্বতন্ত্র। স্বল্পক্ষমতাসম্পন্ন সুরকার হ'লে হয়তো বিবিধ জ্ঞান অথবা ঠুংরির কৌশল প্রয়োগ করতেন ; কিন্তু হিমাংশু-কুমার ব্যবহার করেছেন কেবল কয়েকটি মীড় এবং ছোট ছোট সুনির্বাচিত অলঙ্কার। তাঁর অভিধানে বিবাদী স্বর ছিল না তাই বৈষম্যের মধ্যেও এনেছেন মাধুর্য—কেবল সুনিপুণ প্রয়োগবৈশিষ্ট্যে। এই নৈপুণ্যের প্রকাশ বিশেষ চিন্তাশীল শিল্পী ভিন্ন আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

পরিশেষে একটি বক্তব্য। বারবারই বলেছি, এবারও বলতে হয়। হিমাংশুকুমারের বহু স্বরলিপি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে যা গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নি। এছাড়া অনেকের কাছে তাঁর নিজের লেখা স্বর-লিপি রয়েছে এবং অনেকে তাঁর সুরের স্বরলিপি করেও রেখেছেন। এইসব স্বরলিপি প্রকাশিত এবং একত্রিত হবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। স্বরলিপি প্রকাশের দায়িত্ব অল্প নয় এবং এটি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। শুধু হিমাংশুকুমার নয় আরও বহু সুরকারের অনেক অপ্রকাশিত স্বরলিপি সংকলিত হবার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে কিন্তু এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না কাউকেই। এই নিশ্চেষ্টতার দরুণ আমরা অনেক হারিয়েছি এবং আরও অনেক হারাব। জাতির দুর্ভাগ্য হ'লে এমনটাই ঘটে থাকে।*

কবি শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীগোপেন্দ্রচন্দ্র পাল 'সুরসাগর' সম্বন্ধে বহু তথ্য আমার গোচর করেন। এঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। এঁদের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

সঙ্গীতাচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞদের অন্যতম। কিন্তু অপরাপর সঙ্গীতবিদ্‌গণের মতো তাঁরও কোন বিস্তৃত জীবনী নেই। তাই স্বল্প পরিচয়টুকু দিয়েই তাঁর স্মৃতিতর্পণ করতে বাধ্য হলুম।

বাংলা দেশের যে কটি জনপদে দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় সঙ্গীতের অনুশীলন চলে আসছে তার মধ্যে বিষ্ণুপুর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ভারতীয় সঙ্গীতে, বিশেষ করে ধ্রুপদে বিষ্ণুপুরের একটি স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব রীতি আছে যা বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানা বলে বিখ্যাত। রাধিকাপ্রসাদ এই বিষ্ণুপুরে একটি সঙ্গীতাভিজ্ঞ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা জগৎচাঁদ গোস্বামী বিষ্ণুপুরের একজন শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গবিশারদ ছিলেন এবং পুত্রের সঙ্গীত সাধনায় তাঁর প্রেরণা এবং উৎসাহ ছিল প্রচুর। রাধিকাপ্রসাদ সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করেন বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্য অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সঙ্গীত-কেশরী অনন্তলাল অধুনা ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের পিতা। বহু বৎসর সঙ্গীত সাধনার পর রাধিকাপ্রসাদ কলকাতায় এসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ভারত সঙ্গীত সমাজের কর্তৃপক্ষ রাধিকাপ্রসাদকে আচার্য পদে নিযুক্ত করেন।

কিছুকাল কলকাতায় কাটাবার পর কাশীমবাজারের মহারাজা উদার-চরিত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে কাশীমবাজারে আমন্ত্রণ করে এনে তাঁর সঙ্গীত সভায় আচার্যের পদে নিযুক্ত করেন। এইখানে রাধিকাপ্রসাদ তাঁর কিশোর শিষ্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীকে একাদিক্রমে প্রায় আট বৎসর শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। গিরিজাবাবু উত্তরকালে সঙ্গীতবেত্তারূপে সারা ভারতে খ্যাতিলাভ করে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন।

পরবর্তী জীবনে রাধিকাপ্রসাদ বহু শিষ্যকে শিক্ষা দিয়েছেন, অকাতরে তাঁর সঙ্গীতের পুঁজি বিলিয়ে দিয়েছেন। এই অমায়িক এবং নিরহঙ্কার, সদাশয় ব্যক্তিটি যে কোন লোকের গানে প্রতিভার পরিচয় পেয়েছেন তাকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিক্ষা প্রদান করতে চেয়েছেন। এই কারণে অনেকেই তাঁর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ গোস্বামীকে তিনি সঙ্গীতাভিজ্ঞ ক'রে তুলেছিলেন কিন্তু অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়। মধ্যম ভ্রাতুস্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীকে তিনি বিশেষ যত্নে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল অপূর্বভাবে। তাঁর অকালমৃত্যুও অতীব শোচনীয় ব্যাপার।

বিপুল সম্মান অর্জন করে পরিণত বয়সে রাধিকাপ্রসাদ পরলোক গমন করেন।

রাধিকাপ্রসাদ বাংলা গানের অনুরাগী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত দুটি গান—"বিমল আনন্দে জাগরে" এবং "স্বপন যদি ভাঙ্গিলে রজনী প্রভাতে"—তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীর অনুরোধে রেকর্ড করেন।

বাংলা গানে তানবৈচিত্র্য ও লালচাঁদ বড়াল

বাংলা গানে রাগসঙ্গীতের বৈচিত্র্য আনবার কথা বলছিলাম। কতভাবেই যে এ বৈচিত্র্য আনা যায়, বিশেষ করে আমাদের যখন এমন মনোহর কাব্যসম্পদ রয়েছে। কিন্তু ওস্তাদপন্থীদের মনোভাব এখনও বাংলাগানের সপক্ষে এমন কথা বলতে পারি না। বাংলা-গানের বিরুদ্ধে অনেক কুযুক্তি এখনও তাঁরা দেখিয়ে থাকেন—বড় আসরে বাংলাগান গাইতে এখনও তাঁরা ভরসা পান না। বিরুদ্ধ যুক্তি আগে ছিল অনেক রকম—যথা বাংলা গানে যুক্তাক্ষর বাহুল্যের জন্য তেমন তানের অবকাশ নেই, বাংলাগানে রাগসঙ্গীতের তেমন মেজাজ আসে না, বাংলাগানে সুরকে খেলিয়ে নিয়ে সমে আসবার সময় হিন্দী গানের মত দু-চারটে শব্দকে অবলম্বন করবার সুবিধা নেই। এককথায় বাংলা গান একান্তই মেয়েলী ও ঘরে বসে গাওয়া চলে, আসরে নয়। বলা বাহুল্য কোন আপত্তিই গ্রহণীয় নয়। বাংলাগানে তান দেওয়া চলে না এই যুক্তি দিলীপকুমার রায় মহাশয় চমৎকারভাবে খণ্ডন করেছেন। তাঁর উক্তিই উদ্ধৃত করি :—

"শুনতে পাই না কি বাংলা ভাষায় গান হয় না যেহেতু বাংলার স্বরবর্ণে তান দেওয়া চলে না। কেন চলে না জিজ্ঞাসা করলে উত্তর মেলা ভার। হিন্দুস্থানী ও বাংলা একই আদি সংস্কৃতভাষার অপভ্রংশ, কাজেই হিন্দুস্থানীতে যে স্বরবর্ণ আছে বাংলাতে সেই স্বরবর্ণ আছে—এক হ্রস্ব অ্য (Cup ব্যস্—এদের অ্য) ছাড়া। কিন্তু সত্যি খুবই অবাক লাগে ভাবতে যে, যদি সুকুমারী বঙ্গবাণীর এটা একটা অপরাধই হয় তাহলে মাত্র একটা অকারের অজন্মা হওয়ার দরুন এ-ভাষায় গানের চাষই হবে না এ-দণ্ড ওস্তাদি গানের তালুকদাররা কেমন করে দিলেন ? আমাদের এমন অবর্ণনীয় সুন্দরী গীতিভাষার আশ্চর্য উর্বর জমিতে গানের আবাদ নৈব নৈব চ—এ বিধান দিতে তাঁদের প্রাণে কি একটুও

বাজল না? আমরা বাঙালী বলেই যে বাংলাভাষা নিয়ে গৌরব করি তা তো নয়, এই তো সেদিনও অক্সফোর্ডের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ষ্ট্রাঙ্গোয়েজ সাহেব সারা ভারত ঘুরে তাঁর Music of Hindusthan-এ লিখে গেছেন যে, যেমন তেলেগু হ'ল দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ সাঙ্গীতিক ভাষা তেমনি বাংলা হ'ল আর্যাবর্তের সেরা সাঙ্গীতিক ভাষা। ("Telegu, the most musical language of the South as Bengali is of the North") আর এ তো শুধু ষ্ট্রাঙ্গোয়েজ সাহেবেরই রায় নয়, ধ্বনিলালিত্যে, ছন্দবৈচিত্র্যে, ভাবগরিমায় বাংলা কাব্য বাংলা গান আজ ক্রমে বহু অবাঙালীরও সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। কেবল আত্মঘাতী হ্রস্বদৃষ্টি বাঙালী ওস্তাদিপন্থীরাই এখনো এই সব তুচ্ছ ন্যায়ের ফাঁকিতে মেতে আছেন যে, বাংলা ভাষা স্বরবর্ণে দীন, যুক্তাক্ষরবহুল। জিজ্ঞাসা করি—আমাদের রামপ্রসাদী "প্রসাদ বলে ভবার্ণবে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা: জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা" শ্রেণীর গানের চেয়ে, কি ধরা যাক তুলসীদাসের "নব কুঞ্জলোচন কঞ্জমুখকর কঞ্জ পদ কঞ্জারুণম্" শ্রেণীর গানে যুক্তাক্ষর কম? নিধুবাবুর "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে" ধরনের টপ্পায়; রবীন্দ্রনাথের "জীবনে যত পূজো হ'ল না সারা" শ্রেণীর ধ্রুপদে; দ্বিজেন্দ্রলালের লঘুগুরুছন্দী "এসো প্রাণ সখা এসো প্রাণে —মম দীর্ঘ বিরহ অবসানে" শ্রেণীর খেয়ালে; অতুলপ্রসাদের "আমার বাগানে এত ফুল" শ্রেণীর ঠুংরিতে; কাজি নজরুল ইসলামের "বসিয়া বিজনে কেন একা বনে? পানিয়া ভরণে চল লো গোরী" শ্রেণীর গজলে; অজয়কুমারের "ফোটে ফুল মনের বনে সে কেন যায় রে ঝরে" শ্রেণীর টপ্‌ঠুংরিতে কি স্বরবর্ণের দুর্ভিক্ষ আছে? না, সুরকে যাঁরা লীলায়িত করতে জানেন তাঁরা এসব গানের তালবিস্তারে স্বরবর্ণের একটুও কম সহায়তা পান? এর পর বোধ করি এ বিষয়ে আর কিছু বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই!"

যাঁরা বলেন, বাংলায় হিন্দী গানের মত মেজাজ আসে না তাঁদের

জিজ্ঞাসা করি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় যে সব বাংলা খেয়াল গেয়ে গেছেন এই অল্প কদিন আগে, তাতে কি তিনি একটা জমাট গম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি করেন নি ? না সে সব গান আসরে গাইবার অনুপযুক্ত ? ঠুংরির কথাও যদি বলতে হয়, তবে অতুলপ্রসাদের বহু গান রয়ে গেছে যা আসরে গেয়ে চোখে জল আনা যায় সুর এবং কাব্যলালিত্যে। টপ্পার কথা তো বলাই বাহুল্য, বাংলার মতো এমন মনোহর টপ্পা আর কোথায় পাওয়া যাবে ?

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা এখনো এ বিষয়ে তেমন সচেতন নই। সচেতনতা যে আমাদের আসে নি তা নয়, অনেক বড় বড় গাইয়ে বাংলা গানে কত তান-বৈচিত্র্য দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, কিন্তু বারে বারেই সেটা পড়ে গেছে কেবল আমাদের আত্মলাঘবতার দরুন। হিন্দী গানের কাছে বাংলা গানকে আমরা বরাবরই ছোট করে দেখেছি অনেক বড় বড় শিল্পীর অভয় পাওয়া সত্ত্বেও। একটা কারণ অবশ্য এই যে, গানের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যে সব ওস্তাদ আসর জুড়ে ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই গান গাওয়াটুকুর বেশি ভাববার সামর্থ্য ছিল না। গুরুর কাছে শুনেছেন বাংলা গানে কিচ্ছু নেই, নিজেও সেটা সারাজীবন প্রচার করে গেছেন। কিন্তু এমনি অশিক্ষার যে যুগটা ছিল সেটা আমরা পেরিয়ে এসেছি। এখন গানের ক্ষেত্রে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা কম নয়। সুতরাং চিন্তার অবকাশও কম থাকবার কথা নয়। এখন এই মনোভাব থাকলে চলবে না। বাংলা গানে বৈচিত্র্য আনতে হবে, তানের ফুলঝুরি ফোটাতে হবে এবং সেটা করতে হবে তার কাব্যসম্পদ অক্ষুণ্ণ রেখে। এই রসচেতনা বাংলার সঙ্গীত সমাজে না জাগ্রত করলে আজকালকার গাইয়েরা দেশের কাছে অপরাধী হবেন। তবে, এই চেতনাটি আনতে হলে আমাদের কিঞ্চিৎ প্রস্তুতির প্রয়োজন।

আজকের যুগে বাংলা গানে তানবৈচিত্র্য এবং রাগ সঙ্গীতের অপরাপর বৈচিত্র্য সম্পাদন করতে গেলে এক পুরুষ আগে যে সব প্রচেষ্টা হয়েছিল, তার খবর রাখা দরকার। সঙ্গীতজগতে এই খবর

রাখা একটু দুরূহ ব্যাপার, কেননা বহু শিল্পীর তেমন রেকর্ড নেই। সে সব তানবৈচিত্র্যের প্রমাণ আজ নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। গুণী শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কিভাবে গানের বাণীর সঙ্গে তান মিশিয়ে দিতেন বা অঘোর চক্রবর্তী কেমন দানাদার তান লাগাতেন, আজকে সেটা লিখে বুঝাবার উপায় নেই, একমাত্র লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের নাম বোধ হয় করা চলে, কেননা তাঁর বহু গান রেকর্ড হয়েছিল এবং সে সব এখনো বোধ হয় একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়—অনেক পুরনো পরিবারে রক্ষিত আছে। বাংলা গানে তিনি এক নতুন ওজস্বী রীতিতে তানের প্রবর্তন করে যান। এই অপূর্ব তান-কৌশলে তিনি হিন্দুস্থানী গায়ক মহলেও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন এবং বাংলার সঙ্গীতজগতে বহুদিন তাঁর আসন পুরোভাগেই নির্দিষ্ট ছিল। তাঁর গানে দোষ-ত্রুটি অনেক ছিল—মাঝে মাঝেই গানের সৌকুমার্যকে তিনি অস্বীকার করতেন—তথাপি উচ্ছল তান-হিল্লোলে তিনি যে চমক লাগাতেন, আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করতেন, তা অসামান্য প্রতিভা এবং অক্লান্ত সাধনা না থাকলে পারা যায় না। অনেক গান তিনি এমন গেয়েছেন, যার ভাষা নিতান্তই তুচ্ছ, কিন্তু অজস্র প্রাণশক্তিতে সেই সব গানেই তিনি প্রচুর রস সঞ্চার করতেন। তাঁর বহু ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও এই তান-বৈচিত্র্যে তিনি অননুকরণীয় এবং এই কারণেই তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, যা সে যুগে আর কারুর অদৃষ্টেই ঘটে নি। এক পুরুষ আগে-কার টপ্-খেয়াল গায়কদের প্রতিনিধি হিসাবে এই নতুন যুগে আবার তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য বলে মনে করি। তাঁর কাহিনী বিবৃত করছি এই কারণে যে, কৌতূহলী পাঠক এখনও অনুসন্ধান করলে তাঁর গানের রেকর্ড শুনতে পারেন এবং সে যুগে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিভাবে চলেছিল, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারেন। নতুন প্রচেষ্টার পূর্বে এই আদিপ্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা বিশেষ দরকার, তা না হলে সৃষ্টিতে পরিণতি আসা সম্ভব নয়।

লালচাঁদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৭০ সালে। খাস কলকাতার

বনেদি পরিবারে জন্ম তাঁর। বাবা প্রসিদ্ধ এটর্নি নবীনচাঁদ বড়াল এবং ঠাকুরদাদা ছিলেন প্রেমচাঁদ বড়াল, যাঁর নামে বৌবাজারের সেই রাস্তার নামকরণ হয়েছে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট। তাঁর মাতামহ ছিলেন দানশীল পুণ্যব্রত সাগরলাল দত্ত।

লালচাঁদ লেখাপড়া শেখেন সেণ্ট জেভিয়ার্স এবং ডাভটোন কলেজে। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ডাভটোন কলেজের অধ্যক্ষকেই তাঁর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি বহু ইংরেজী ক্লাব এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তাঁর বাবা গান বাজনার তেমন অনুকূলে ছিলেন না কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তিনি সঙ্গীতের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। মার কাছ থেকে গোপনে অর্থসাহায্য পেতেন সঙ্গীত শিক্ষার জন্য। অল্প বয়সেই তিনি পাখোয়াজে কৃতবিদ্য হন মুরলীমোহন গুপ্তের শিক্ষকতায়। বহুবিধ যন্ত্রসঙ্গীতেই তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। হার্মোনিয়ম, পিয়ানো, জল-তরঙ্গ, বাঁয়া-তবলা সবই তিনি বাজাতে পারতেন দক্ষতার সঙ্গে। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে সন্ধ্যাবেলায় পিয়ানোর ক্লাস হতো। সেখানে নিয়মিত যোগ দিয়ে তিনি চমৎকার পিয়ানো বাজনা শিখেছিলেন। পরে বড় বড় ওস্তাদের কাছে তালিম নিতে আরম্ভ করলেন। ধ্রুপদে তাঁর গুরুর মধ্যে বিশ্বনাথ রাও, জগকরণ মিশ্র এবং কাশীনাথ মিশ্র অন্যতম ছিলেন। খেয়াল শিখেছিলেন তদানীন্তন বিখ্যাত গায়ক নুলোগোপাল (এঁর কাছে ওস্তাদ আলাউদ্দিনও গান শিখেছিলেন), গুরুপ্রসাদ মিশ্র এবং নান্দে খাঁর কাছে। টপ্পা শিখেছিলেন স্বনামধন্য রমজান মিঞার কাছে। রমজান এবং নুলোগোপালের কাছে শিক্ষার জন্য বোধ হয় তাঁর তানে খেয়ালিয়া ঢঙের সঙ্গে টপ্পাভঙ্গীর একটা চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তাঁর তান ছিল টপ্-খেয়াল শ্রেণীর। এই সব দ্রুত তান ছিল ঠিক মেঘের ভিতর দিয়ে যেমন চকিতে বিদ্যুৎ খেলে যায় সেই রকম চঞ্চল এবং চমক লাগানো। কতরকম ভাবে এক একটা বাণীকে তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতেন, শুধু নানা ঢঙের

তান আনবার জন্য। তবু তো তখন বাংলা গান কাব্য-সুষমায় এত মনোহর হয়ে ওঠে নি। আজকের এই ঐশ্বর্যমণ্ডিত কাব্যসঙ্গীতে তানবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে আরও কত উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ রয়েছে।

ক্রমে তাঁর সঙ্গীতের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক সম্ভ্রান্ত আসরে সৌখিন শিল্পী হিসাবে তিনি যেমন যোগদান করতেন, তেমনি গ্রামোফোন কোম্পানীকেও গান বিতরণ করতেন বিনা পারিশ্রমিকে। সে যুগে তাঁর রেকর্ডের চাহিদা ছিল প্রচুর। গ্রামোফোন কোম্পানী কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ বিলাত থেকে একটি দামী মোটরগাড়ি আনিয়ে তাঁকে উপহার দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু সে গাড়ি এসে পৌঁছবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর সঙ্গীতের খ্যাতি বহু দূরদেশে পৌঁছেছিল। কাবুলের আমীর তাঁর গান শোনবার জন্য কলকাতায় এসে তাঁর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি অসুস্থ, নিজে দেখা করতে পারেন নি। তাঁর পিতা আমীরের সেক্রেটারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, লালচাঁদ সুস্থ হলে তাঁকে তিনি কাবুলে পাঠিয়ে দেবেন আমীরকে গান শোনাবার জন্য। সে আর হয়ে ওঠে নি। সেই অসুখেই মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে ১৯০৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর তিন পুত্র। সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ, বিশেষ করে রাইচাঁদ বড়াল মহাশয়ের খ্যাতি বহু বিস্তৃত।

সে যুগের এই সব বাংলা গানের কথায় আর একটা কথা মনে পড়ল এবং সেটাও এই উপলক্ষ্যে বলে রাখা কর্তব্য। বছর কয়েক আগে কেউ কেউ খবরের কাগজে চিঠি লিখে গ্রামোফোন কোম্পানীকে অনুরোধ করেছিলেন, সেকালের এই সব শ্রেষ্ঠ গায়কের সুবিখ্যাত গানগুলি আবার নতুন করে প্রকাশ করবার জন্য। গ্রামোফোন কোম্পানী তার উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, প্রাচীন রেকর্ডের মূল রূপগুলি তাঁরা ইতিমধ্যে বিনষ্ট করে ফেলেছেন; সুতরাং সেগুলি আর পুনঃপ্রচারের উপায় নেই। আমার যতদূর মনে পড়ছে,

১৯৩০।৩১ সালেও এই সব পুরনো গানের অনেকগুলি পাওয়া যেতো এবং আমরা সুদূর মফস্বলেও এসব অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি। এখন আর একটি কপিও পাবার উপায় নেই। এ নিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীকে দোষ দেওয়া চলে না, কেননা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাঁদের পুরনো জিনিস স্তূপাকার করে রাখবার উপায় নেই। তবে একটি কাজ করা যেতে পারে। কোন গবেষক বা সাঙ্গীতিক প্রতিষ্ঠান উক্ত কোম্পানীর সহায়তায় যদি সেকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের রেকর্ডের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন, তাহলেও সঙ্গীতামোদীদের অনেক উপকার হয়। খোঁজ নিয়ে তাঁরা কোনও কোনও স্থান থেকে এসব গান শুনতেও পারেন এবং কোন্ কোন্ বিখ্যাত প্রাচীন বাংলা গানের রেকর্ড হয়েছে, সেটাও তাহলে জানা যায়। স্বয়ং গ্রামোফোন কোম্পানী যদি এ কাজটি করেন, তাহলে তো খুবই ভাল হয় বলাই বাহুল্য। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের গানের যত রেকর্ড হয়েছে তার একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে দেখেছি। এর থেকে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী যে রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করেছিলেন, সেটি জানা যায় এবং এমন একটি গান গেয়েছিলেন, যার কোন স্বরলিপি নেই। অতএব এই ধরনের রেকর্ডের মূল্য যে খুবই বেশি একথা আর বলে বোঝাবার দরকার নেই।

সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর

সম্প্রতি ভবানীপুর সঙ্গীত-সম্মিলনী গৃহে সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের একটি প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে। আমাদের সঙ্গীত শিক্ষার প্রসারে গিরিজাশঙ্করের অপরিমিত উৎসাহের কথা স্মরণ করলে বিস্মিত হ'তে হয় এবং আজ বাঙলার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে নব আলোড়ন দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সঙ্গীত-প্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে প্রচলন হয়েছে তার মধ্যে কিছু নূতনত্ব আছে। এই গায়ন-রীতি ঠিক পূর্ব-রীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করছে না—এর মধ্যে শিল্পীর একটা স্বকীয়তা এসেছে এবং এই স্বকীয়তা অনেক পরিমাণে পরিমার্জিত। আজকের দিনের শিল্পীবা, বিশেষ ক'রে বাঙালী শিল্পীরা দুরূহ এবং শ্রুতিকটু সঙ্গীত শৈলী পরিহার করেন, কিন্তু তার মানে এ নয় যে তাঁবা সঙ্গীতের দুরূহ শিক্ষার পথে অগ্রসর হ'তে অনিচ্ছুক—কাঁটার নিবিড় অরণ্য তাঁরা পরিশ্রম করেই ভেদ করেন, কিন্তু তুলে ধরতে চান সকল-কাঁটা-ধন্য-করা গোলাপ ফুলটিকেই। শিক্ষা যতই অগ্রসর হ'চ্ছে সৌন্দর্যবোধও ততই জাগ্রত হ'চ্ছে এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াসও ততই সুষ্ঠু পরিণতির দিকে চলেছে। এটিই এই যুগের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হ'লে বহুশ্রুত হওয়া আবশ্যক। এই কারণেই এক যুগ পূর্বের শিল্পকৌশল সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হয়েছে এবং আজকাল ভারতের প্রাচীন শিল্পীদের প্রায়ই আবার কলকাতার নানা আধুনিক আসরে দেখা যায়। অনেকের কণ্ঠেই আধুনিক প্রয়াসে প্রাচীন অলঙ্করণেব কিছু প্রভাব দেখা যায় এবং এই দুটি পদ্ধতিতে মিলিয়ে একটি নূতন সৃষ্টির শিহরণে শ্রোতা পুলকিত হ'য়ে ওঠেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রাচীনেব এই যে স্বীকৃতি এটি অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

গিরিজাশঙ্কর যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখনও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে একটি নব আলোড়নের সূত্রপাত হয়েছে। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক যুগের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধ্রুপদী রীতির প্রাধান্য তখনও বজায় আছে কিন্তু খেয়ালের বিকাশ এক নিজস্ব ভঙ্গী নিয়ে সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করছে এবং ঠুংরির আবহাওয়াটা তখন একটু একটু করে জমাট হ'য়ে আসছে। বাঙলার কাব্যসঙ্গীত ইতিমধ্যেই এক নিজস্ব রূপ নিয়েছে এবং সে রূপে প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিভিন্ন নবীন প্রচেষ্টা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে খেয়াল-ঠুংরির ভিতর দিয়ে যে প্রগতির সূচনা হয়েছে, গিরিজাশঙ্কর সেই সূচনার যুগ থেকেই সঙ্গীত জগতে প্রবেশ লাভ করেন।

বহুশ্রুত ব্যক্তি ছিলেন তিনি এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা, বিভিন্ন ঘরানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতও ছিলেন। এর ফলে তিনি এই সব বিভিন্ন ধারা থেকে সঙ্গীতে একটি সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি একটি চমৎকার শিক্ষাধারার প্রবর্তন করেন এবং সে শিক্ষায় তাঁর বহু ছাত্র পরবর্তী-কালে সঙ্গীতে কৃতিত্ব লাভ করেছেন। বস্তুত, গিরিজাশঙ্কর একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-গুরু বলেই পরিচিত ছিলেন। এক সময় তাঁর কাছে কিছুকাল শিক্ষালাভ না করলে সঙ্গীত সাধকের তৃপ্তি হ'ত না। পরিণত বয়স্ক থেকে তরুণ বয়স্ক পর্যন্ত সকলেই অতি আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁর যুগে তাঁর মত জনপ্রিয় সঙ্গীত-শিক্ষক আর ছিলেন কি না সন্দেহ।

গিরিজাশঙ্করের প্রধান কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি সঙ্গীতের কোন একটি বিশিষ্ট ঘরানার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখেন নি। ভারতের নানা স্থানে প্রধান প্রধান ওস্তাদের সংস্পর্শে এসেছেন এবং তালিম নিয়েছেন। এর ফলে তাঁর এমন একটি সঙ্গীত বোধ জাগ্রত হয় যা তাঁকে সম্পূর্ণ একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদান করে এবং তাঁর

শিক্ষাধারার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ ঘটেছিল। ঠুংরিতে তাঁর অসাধারণ পারদর্শিতার কথা সকলেই জানেন—খেয়ালও তাঁর কাছ থেকে শিখেছেন অনেকেই, কিন্তু ধ্রুপদী হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। বিষ্ণুপুর-ঘর থেকে সেনীঘর পর্যন্ত ধ্রুপদী রীতি তিনি বিশেষ পরিশ্রম সহকারে শিক্ষা করেছিলেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এই তিনটি শ্রেণীতেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল তথাপি গিরিজাশঙ্করের যুগ হ'চ্ছে খেয়াল-ঠুংরির যুগ—বিশেষ করে বাঙলায় ঠুংরির প্রগতির মূলেই তাঁর প্রভাব বর্তমান।

এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-গুরু বৌবাজারের নগেন দত্ত মহাশয়ের কথা মনে পড়ছে। খেয়াল এবং টপ্পার শিক্ষাদানে তাঁর কৃতিত্বও বড় কম ছিল না, বিশেষ করে টপ্পায়। টপ্পার ভাণ্ডার তাঁর ছিল অফুরন্ত এবং বাংলা টপ্পা আর উর্দু টপ্পা পাশাপাশি গেয়ে তিনি দুটি রীতির বিশ্লেষণ করতেন। ব্যাপক সঙ্গীতজ্ঞানের ফলে এই যে একটি নিপুণ দৃষ্টিভঙ্গী, এই যে শিক্ষার্থীদের সঙ্গীতের মূল-রসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, এইটি প্রকৃত সঙ্গীতবোধ না হ'লে আসে না এবং বহু প্রচেষ্টায় স্বল্প কয়েক ব্যক্তির মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হয়েছিল বলেই বিংশ শতকে বাঙলায় খেয়াল-ঠুংরি এবং ধ্রুপদের প্রচারে শৈথিল্য ঘটে নি পরন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি শিক্ষিত এবং পরিমার্জিত কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে।

গিরিজাশঙ্কর ১৮৮৫ সালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভবানীকিশোর চক্রবর্তী ছিলেন বহরমপুরের একজন প্রসিদ্ধ উকিল। জমীদার হিসাবেও তাঁদের স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল।

ছেলেবেলা থেকেই গিরিজাশঙ্করের ছবি আঁকা তথা ললিতকলার প্রতি আকর্ষণ ছিল খুব বেশি। চিত্রাঙ্কণ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য তিনি কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। এই-খানে ছবি আঁকা এবং সঙ্গীত সাধনা দুটোই বেশ ভাল রকম অগ্রসর

হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের বহু সম্ভ্রান্ত গৃহে গিরিজাশঙ্করের আঁকা তৈলচিত্র বা জলরঙের ছবি বর্তমান।

গিরিজাশঙ্করের প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ হয় আঠারো বৎসর বয়স থেকে। এই সময়ে সেকালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতবিদ্যালয়ে গান শেখাচ্ছিলেন। গিরিজাশঙ্কর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। আট বৎসরকাল তিনি গোস্বামী মহাশয়ের কাছে ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ তাঁকে যেমন স্নেহ করতেন গিরিজাশঙ্করও তাঁকে তেমনি শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। উত্তরকালে গোস্বামী মহাশয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই গিরিজাশঙ্কর উৎসাহিত হয়ে গুরুর স্মৃতিকাহিনী বিবৃত করতেন।

বহরমপুরের শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে তিনি লখনউবাসী এক মৌলবীর কাছে উর্দু এবং হিন্দী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। খাঁটি উর্দুতে চমৎকার কথাবার্তা বলতেন তিনি। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীতে জ্ঞানার্জনের জন্য ঘুরে বেড়াবার সময় এই উর্দু-হিন্দীর জ্ঞান তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ঠুংরিতে খাঁটি উর্দু উচ্চারণ একটি শোনবার জিনিস—খুব কম লোকেরই এই উচ্চারণ ক্ষমতা থাকে। গিরিজাবাবু এই বিশুদ্ধ উচ্চারণ ভঙ্গী চমৎকারভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। বহরমপুরে গান শেখবার সময় তিনি মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। এখানে অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'ত। একবার কলকাতায় এসে তিনি শ্যামলাল ক্ষেত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ক্ষেত্রী মহাশয় গিরিজাশঙ্করের কৃতিত্বে অত্যন্ত প্রীত ছিলেন এবং আজীবন তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহের চক্ষে দেখেছেন। শ্যামলালবাবুর পৃষ্টপোষকতায় গিরিজাশঙ্কর সঙ্গীত শিক্ষার বহু সুযোগ লাভ করেছিলেন—শুধু কলকাতায় নয়, ভারতের নানা স্থানে।

শ্যামলাল ক্ষেত্রী মহাশয় গিরিজাশঙ্করকে গোয়ালিয়রের অদ্বিতীয় ঠুংরি গায়ক ভাইয়া সাহেব গণপৎ রাও-এর সঙ্গে পরিচিত করে দেন এবং এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি ঠুংরিতে বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করেন।

ঠুংরিতে বিশেষত্ব অর্জনের আর একটি প্রধান সহায়ক হ'ল সেকালের শ্রেষ্ঠ ঠুংরি গায়ক মৌজদিনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। মৌজ-দিনের সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক এবং তাঁর কাছ থেকে ঠুংরির বহু কলা-কৌশল তিনি আয়ত্ত করেন। বস্তুত ঠুংরি সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা যে তিনি মৌজদিনের কাছ থেকেই পান এবং ঠুংরিতে মৌজদিন যে তাঁর আদর্শস্বরূপ ছিলেন একথা গিরিজাশঙ্কর সানন্দে স্বীকার করতেন।

দিল্লীতে তিনি খেয়ালে তালিম নেন শ্রেষ্ঠ খেয়ালী মুজঃফর খাঁর কাছে। এঁদের ঘর বিশুদ্ধ খেয়ালের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং এঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল গমক এবং ছুনী তানে। গিরিজাশঙ্কর এই ছুনীতানটি অতি নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।

দিল্লী থেকে তিনি এলেন রামপুরে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছে। রামপুরে সেনী ঘরানার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মহম্মদ আলী খাঁর কাছে তিনি ধ্রুপদ এবং ধামারে তালিম নেন। শুধু তাঁর কাছেই নয় নবাব ছম্মন সাহেব এবং উজীর খাঁর কাছেও হোরী-ধ্রুপদের তালিম নিয়েছিলেন। রামপুরে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নবাব ছম্মন সাহেব।

রামপুর থেকে কলকাতায় ফিরলেন তিনি ১৯১৮ সালে। এরপর থেকে এগারো বৎসর তিনি হ্যারিসন রোডে শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়িতে স্থায়ীভাবে বাস করেন এবং ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে খেয়ালে তালিম নেন। ওস্তাদ ছোটে মুন্নে খাঁর কাছ থেকেও তিনি কিছু শিক্ষালাভ করেন। খেয়াল-ঠুংরিতে বিশেষত্ব অর্জন করলেও ধ্রুপদের চর্চা তিনি বরাবরই রেখেছিলেন। এই সময় মেবারের একজন ধ্রুপদীর সহায়তায় তিনি হোরী, ধ্রুপদ সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানলাভ করেন।

১৯৪৮ সালে মে মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

গিরিজাশঙ্করের সমসাময়িক সঙ্গীতাচার্যদের অনেকেই আজ গত হয়েছেন। সেকালের সঙ্গীতসাধকগণকে কঠোর নিয়মে এবং বহু আয়াসে গান শিখতে হয়েছে,—ভ্রমণ করতে হয়েছে নানা প্রদেশে। আজকের রেডিও এবং সঙ্গীত সম্মেলনের যুগে যেটা সহজলভ্য হয়েছে সেকালে সেটা ছিল না—যথার্থ সঙ্গীত শিক্ষা যথার্থই পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল। এই উপলক্ষ্যে তাঁদের বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতার ব্যাপক পরিচয় আমরা যদি পেতাম তাহলে সঙ্গীত জগতের অনেক নতুন খবর মিলত। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়ে উঠে নি—সঙ্গীতজগতের বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিদের জীবনকাহিনী আজ দুর্লভ। এঁরা শিষ্যাদি কম রেখে যান নি এবং তাঁদের মধ্যে বিত্তবান ব্যক্তির সংখ্যাও স্বল্প নয়, অথচ গুরুর জীবন-কাহিনী সঞ্চিত রাখবার প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে দেখা দেয় নি। কিছুকাল পূর্বে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে দেখি দু-একটি পত্রিকায় অপটু এবং অপূর্ণ প্রবন্ধে কথঞ্চিৎ উল্লেখ ভিন্ন আর কোন তথ্যই পাওয়া যায় না, অথচ গোস্বামী মহাশয়ের কত যশ প্রতিপত্তিই না ছিল! আজ তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী মেলে না। এইভাবে গিরিজাশঙ্করের জীবনী-পরিচয়ে এসেও ঠেকেছি—তাঁর সম্বন্ধে তথ্যাদিও এরই মধ্যে দুর্লভ হ'য়ে পড়েছে। এঁরা এক একটা যুগে সঙ্গীত জগতে আধিপত্য করে গেছেন—এঁদের জীবন-কাহিনী মানেই হ'চ্ছে বাঙলার সাঙ্গীতিক ইতিহাসের এক এক অধ্যায়ের পরিচয়। অতএব এই সব পূর্ণাঙ্গ জীবনী সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন ঘটেছে। কিন্তু এই সংগ্রহের দায়িত্ব কে নেবে? এত কনফারেন্স আর জলসায় সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় হ'চ্ছে আর এই সব ঐতিহাসিক প্রযত্নে কিছু ব্যয় হ'লে সে কি খুব বেশি হবে? আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষার্থে অবিলম্বে এই কর্তব্যভার কোন দায়িত্ব-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রহণ করা উচিত একথা যে বলবার আবশ্যকতা হয়েছে এইটিই দুঃখের বিষয়।

বাংলা গানে মানবতন্ত্র

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—এই কথাটি বাংলা গানের পক্ষে সবচেয়ে বেশি খাটে। বাংলার সঙ্গীতে মানুষ এবং মানবিক ভাবধারাই প্রধান বস্তু। বাংলা গান নানারকম কলা কৌশল বা খুব উচ্চতত্ত্ব প্রকাশের জন্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নি কিন্তু অতি সহজে আমাদের সামাজিক জীবনের কয়েকটি অনুভূতির অপূর্ব প্রকাশ বাংলা গানে ঘটেছে, আর এইখানেই বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শই বাংলা গ্রহণ করেছে কিন্তু সে শুধু আকৃতিগতভাবে; দরবারি সঙ্গীত বা হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীতের বিকাশ উত্তর ভারতে যেভাবে ঘটেছে, বাংলায় সেভাবে ঘটে নি। বস্তুতঃ বাঙালীর ভাবধারা দরবারি সঙ্গীতের আদর্শে চলে নি। কোনদিক দিয়ে ধরা ছোঁয়া যায় না এমন রাগ বিস্তার বাঙালীর মনঃপূত নয়। বাঙালী সঙ্গীতে একটি বস্তুকে খুঁজেছে, একটি গ্রাহ্য রূপ বা আকৃতি তার চাই যার অর্থ আছে, যা আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে জড়িত এবং সেই ভাবেই সে তার সঙ্গীতকে সংগঠিত করেছে। এই আদর্শেই পুরাতন নাটগীতির সৃষ্টি এবং এই ভাবধারার ফলেই মঙ্গলকাব্য রচিত হ'য়ে এসেছে।

বাংলায় হিন্দুরাজত্ব অবসানের প্রাক্কালে জয়দেব "গীতগোবিন্দ" রচনায় যে সঙ্গীত পরিকল্পনা করেছিলেন তা গভীরভাবে রোমান্টিক এবং এই রোমান্টিক গীতালেখ্যকে রূপ দেবার জন্য তিনি প্রসাদগুণ-সম্পন্ন সাঙ্গীতিক রূপবন্ধকে গ্রহণ করেছেন। এই গীতবন্ধের সৌন্দর্য, সৌকুমার্য এবং ছন্দবৈচিত্র্য বাংলার সঙ্গীতের উপর এত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই প্রভাব থেকেই প্রমাণিত হয় যে বাংলার সঙ্গীতে রাগসঙ্গীতের দুরূহ কলা-কৌশলের চেয়ে মানবিক অনুভূতির বৈচিত্র্যকেই প্রাধান্য দেওয়া

হয়েছে। আর একটি উদাহরণ হচ্ছে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"। বৈচিত্র্যের দিক থেকে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" "গীত গোবিন্দে"র চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিন্তু সাহিত্যিক সৌকার্যের দিক থেকে নয়। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" বহুতর গীত পদ্ধতি এবং ছন্দের মিশ্রণ ঘটেছে। তাছাড়া এই নাটগীতিতে লোকসঙ্গীত এবং কাব্য সঙ্গীত এই দুই-এরই সংযোগ সাধিত হয়েছে। এখানেও সেই সামাজিক জীবনেরই নানা অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে।

এই মানবতান্ত্রিকতার পরিচয় কীর্তনেও মেলে যদিচ কীর্তন আধ্যাত্মিক সঙ্গীতরূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর কিছুকাল পরে নামকীর্তনের সঙ্গে সুর-সুষমায় গৌরবান্বিত পদাবলী গায়নের প্রচলন হয়। এই পদ্ধতির প্রচারক নরোত্তম ঠাকুর উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু কীর্তনে সেসব প্রয়োগবিধি সম্পূর্ণভাবে আরোপ না ক'রে তিনি কয়েকটি সরল পদ্ধতির প্রয়োগে পদাবলী কীর্তনের সংগঠন করলেন। অনেকে বলেন প্রাচীন কীর্তনে ধ্রুবপদের প্রভাব সুস্পষ্ট কিন্তু কীর্তনের গঠন সম্বন্ধে যেসব বিস্তারিত বর্ণনা আছে তাতে ধ্রুবপদের উল্লেখ নেই। যদি নরোত্তম স্পষ্টভাবে ধ্রুবপদবিধি প্রয়োগ করতেন তাহ'লে তার উল্লেখ থাকত কেননা সেই সময়ে উত্তর ভারতে সগৌরবে ধ্রুবপদের অভ্যুত্থান চলেছে। আসলে ধ্রুবপদ একটি সম্পূর্ণ নূতন রীতি নয়। তৎকাল-প্রচলিত প্রবন্ধসঙ্গীতের পদ্ধতিতে বহু বিকৃতি ঘটায় তাকে সময়ানুযায়ী রুচির উপযোগী করে সংস্কার করবার প্রয়োজন হয়েছিল। এই প্রয়োজনের ফলে পুরাতন রীতির কিছু অদলবদল করে ধ্রুবপদ রচনা করা হয়। প্রাচীন কীর্তনে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন-ধারায় যে একটা বিলম্বিত রীতি ছিল তারই পরিচয় মেলে। এটা ধ্রুবপদের বৈশিষ্ট্য বলে নয়, প্রাচীন সঙ্গীতের চলনই ছিল এই ধরনের। ধ্রুব-পদকে বাঙালী মর্যাদা প্রদান করেছে কিন্তু অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে নি কেননা বাঙালীর আবেগপ্রবণ ভাবধারা ধ্রুবপদের গম্ভীর এবং মন্থর গতির সঙ্গে কোনকালেই খাপ খায় নি। ফলে, উনবিংশ শতকের ধর্মীয়

আন্দোলনের প্রত্যক্ষপ্রভাবে বাংলা ভাষায় কিছুকিছু ধ্রুবপদাঙ্গ গান রচিত হয়েছে মাত্র, পরে আর সে প্রভাব কার্যকর হয় নি। ধ্রুবপদকে একটা আর্ট হিসাবে বাংলায় গ্রহণ করা হয় নি। নীতিবাদীরা ধ্রুবপদের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের ধর্মাত্মক প্রচারের জন্য সুতরাং বাংলায় ধ্রুবপদ আধ্যাত্মিক প্রচার-সঙ্গীতের ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয় নি। এমনকি প্রাচীন কীর্তনও তার অতি বিলম্বিত এবং গুরুগতির জন্য খুব বেশিদিন চলে নি, তাকে প্রাণবন্ত করবার জন্য আরও বেগবান এবং ছন্দশীল ক'রে গঠন করতে হয়েছিল। এই কারণেই পরে কীর্তনের অনেকগুলি ধারার সৃষ্টি হয়।

এইভাবেই বাংলা গান চলে এসেছে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই শতাব্দীর শেষদিক থেকে বাংলা গানে আবার নতুন প্রয়োগবিধির প্রয়াস দেখা গেল। নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) টপ্পায় প্রণয়সঙ্গীত রচনা করলেন। টপ্পা এসেছিল উত্তর ভারত থেকেই কিন্তু বাংলায় তার রূপ এবং গঠনের অনেক পার্থক্য ঘটল। এই পরিবর্তন খুব চিন্তা করেই সাধন করা হয়েছে। নিধুবাবু যে প্রণয়সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তার আবেদন উত্তর ভারতীয় টপ্পার দ্রুততানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তাকে তিনি ধীর আন্দোলনযুক্ত তানে প্রকাশ করেছিলেন। নিধুবাবুর রচনা একান্তভাবে মানবতান্ত্রিক এবং পরবর্তী টপ্পা রচয়িতাগণ টপ্পার এই সংস্কৃত রীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন। যদিও সে সব রচনায় অনেকক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে কিন্তু সে রাধাকৃষ্ণ আমাদের সামাজিক জীবনের সুখদুঃখের অনুভূতিকেই প্রকাশ করেছে। এই টপ্পার রীতি কথকতা পাঁচালীর মত সঙ্গীতকেও প্রভাবান্বিত করেছে। ফলে এই সব পালার বহু গানে লোকগীতির আবেদন বজায় রেখেও কাব্যসঙ্গীতের প্রসাদগুণ আনা সম্ভব হয়েছে।

ক্রমে টপ্পারীতিতে প্রণয়সঙ্গীতের আধিক্য ঘটায় প্রণয়কে উপলক্ষ্য ক'রে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কিছু কিছু গান রচিত হ'তে লাগল। তদানীন্তন সমাজসংস্কারকগণ এই সুযোগই খুঁজছিলেন। সুনীতি এবং সুরুচির

দোহাই দিয়ে তাঁরা দুর্লভ প্রণয়সঙ্গীতের সমূলে উচ্ছেদ ঘটালেন। তাঁরা ছিলেন শিক্ষিত এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি, অতএব তাঁদের প্রভাব যথেষ্ট কার্যকর হয়েছিল। এই টপ্পাদমন আন্দোলনে একবারও ভেবে দেখা হয় নি যে এসব গানে প্রকৃত সম্পদ কতখানি আছে এবং আন্দোলনটিও চতুর এবং সূক্ষ্মভাবে করা হয়েছে অর্থাৎ খুব প্রকাশ্য-ভাবে না ক'রে ভেতরে ভেতরে করা হয়েছে। হিন্দুসমাজের পৌত্তলিকতা-বিরোধীদল সুকৌশলে সুকুমার প্রণয়সঙ্গীত-পুত্তলিকাকে অপসারিত করে সেখানে নিরাকার নির্বিকার ধ্রুবপদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কপালদোষে প্রণয়সঙ্গীতেব আতিশয্য যেমন বরদাস্ত হয় নি তেমনি অতিমাত্রায় পারমার্থিক নিরাকার সমর্থক সঙ্গীতও সমর্থিত হ'ল না। অবশেষে কোনদিকই বজায় রইল না এবং যেহেতু বাঙালী সঙ্গীতে চিরকাল নিরাকার বিরোধী এবং কোন একটি আকারকে দেখতে অভ্যস্ত সেহেতু আবার নবসৃষ্টির প্রয়াস দেখা দিল।

এবারের প্রচেষ্টায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা অগ্রণী হলেন এবং এঁরা পুরাতন টপ্পা বা ধ্রুবপদ্ধতিকে উপেক্ষা না করে তাদের বেশ সুসংস্কৃত করে নিয়ে সঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করলেন। এতে কাব্যসঙ্গীতের যে সাহিত্যিক দিক আছে তার উৎকর্ষ সাধিত হ'ল কিন্তু সব মিলিয়ে এ রচনা সর্বজনগ্রাহ্য হল না। গতযুগের গানের সঙ্গে এযুগের গানের এই তফাৎ। নিধুবাবুর গান সংস্কৃতিবান সুশিক্ষিত ব্যক্তি থেকে সাধারণ লোক সবাই সমানভাবে উপভোগ করতে পারতেন, পাঁচালী কথকতাও তাই, কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষে যাঁরা সঙ্গীত রচনায় অগ্রণী হলেন তাঁরা বিদগ্ধজন; সাধারণ লোককে তাঁদের রচনা বুঝতে হলে কিছু খাটতে হয়। এদিক্ দিয়ে তাঁদের রচনা যে খানিকটা কৃত্রিম সেটা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। এঁদের গানে যে মানবতান্ত্রিক আবেদন তা সর্বসাধারণের স্তরে নেমে আসে নি, তা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানসিক বিলাসকেই প্রধানতঃ ফুটিয়ে তুলেছে। একটা উদাহরণ দিই—

"কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছল ভরে।
ওগো ঘরে ফিরে চলো কনককলসে জল ভরে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

"ওগো সজনী রাই অঙ্গ সাজাব দিয়ে কি ভূষণ।
ও যার রূপে রইল ঢাকা বাকা-শশীর কিরণ॥
রাই রমণীর শিরোমণি ও-অঙ্গে সাজানো মণি
যাঁর ভূষণ শ্যাম চিন্তামণি চিন্তে মুণিগণ॥"

(দাশরথি রায়)

একজন কনককলসের পরিকল্পনা করেছেন,—এটি অভিজাত পরিকল্পনার ফল এবং অপরজন সমস্ত মণিমাণিক্যের চাকচিক্য বর্জন করেছেন—এটি সাধারণ অনুভূতির ফল। রবীন্দ্রনাথের রচনায় অবশ্য দোষের কিছু নেই—অন্যভাবে ভাবতে পারা বা রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না কিন্তু এটাও ঠিক যে তাঁর রচনাকে সর্বজনীন করে তোলাও সম্ভব নয়। যাই হোক, পরবর্তী সুরকারগণ চেষ্টা ক'রে আমাদের সঙ্গীতকে সংগঠিত না করলে ক্ষতির পরিমাণ কম হ'ত না।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে কাব্যসঙ্গীতকে সবদিক থেকে সুন্দর এবং মসৃণ করে তোলবার বিশেষ চেষ্টা হয়েছে। সৌন্দর্য, চাকচিক্য এবং সৌকার্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্ত্যসঙ্গীতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার গানে যে মহিমান্বিত বলিষ্ঠতা নিয়ে এলেন তার পরিচয়ও ইতিপূর্বে মেলে নি। অতুলপ্রসাদ সুললিত সৌকুমার্যে বাংলা গানকে রসায়িত করেছেন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি এঁদের সৃষ্টি সাধারণের নাগালের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে। এর ফলে, কিছুকাল পরে যখন গ্রামোফোনের দৌলতে সঙ্গীতের প্রচার সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হ'তে লাগল তখন আবার আর একটা পরিবর্তন দরকার হ'ল এবং সঙ্গীতকে সর্বস্তরের উপযোগী ক'রে রচনা করবার প্রয়াস দেখা দিল। কাজী নজরুল ইসলাম বহু বিচিত্র সঙ্গীত সৃষ্টি করে এই প্রচেষ্টায় বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু গভীর

মনের উপযোগী সঙ্গীতও কম রচিত হয় নি। উদাহরণস্বরূপ দিলীপ-কুমারের প্রচেষ্টার উল্লেখ করা যেতে পারে। হিমাংশুকুমারের সুরও গভীর অনুভূতির প্রকাশক।

গত যুদ্ধ থেকে আমাদের সঙ্গীতে যে পরিবর্তন এসেছে তার একটি প্রধান দিক হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন ক্লিষ্ট জীবনেব অনুভূতির প্রকাশ। এ পর্যন্ত সঙ্গীত ছিল সহজশিল্প কিন্তু এখন সঙ্গীতে জীবন-সংগ্রামের প্রখরতা একটা ছাপ রাখতে চাইছে। হতাশা, বেদনা, গৃহহারার দুঃখ, ক্ষুধা, ক্লেশ—সব অনুভূতিই বর্তমানে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের যে বিস্তারধর্মী আর্ট আছে সেদিক থেকে বিচার করলে এ-সঙ্গীত হয়ত খুব বড় নয় কিন্তু মানবিক ভাবধারাব দিক থেকে এসব বচনার বিশেষ মূল্য আছে। তাই এই ধরনের রচনা আজকাল বিশেষ লোকপ্রিয়। যাঁবা উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত বা সঙ্গীতের বস্তু-সাপেক্ষ দিকটা নিয়েই বিশেষ আলোচনা কবেন, তাঁরা হয়তো এসব গানের কোন মূল্য দিতে চাইবেন না কিন্তু আমার ধারণা বাংলার সঙ্গীতে এই ধরনেব রচনার একটা স্থান থাকবেই কেননা বাঙালীর চিরন্তন মানবিক অনুভূতিব প্রকাশই এসব গানে ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবেও। তবে, অপরাপর সঙ্গীতে সুর এবং রচনার দিক থেকে বাংলা আগের চেয়ে অগ্রসর হ'তে পাবে নি। আমাদের সঙ্গীত এখন সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে তাদের নির্দেশে চলেছে এটাও এই অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে যোগ্য প্রতিভার অভাব।

তথাপি, অগ্রগতির একটা বড় লক্ষণ হচ্ছে এই যে আমাদের বর্তমান রচয়িতাগণ অব্যবহিত পূর্ববর্তী রচয়িতাদের প্রভাবকে অতিক্রম করতে চাইছেন এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও অনেক রচনায় পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে রচনা সামাজিক আদর্শে অনুপ্রাণিত, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে আশ্রয় করে রচিত হচ্ছে এবং এইসঙ্গে সঙ্গীতে আর্টের দিকটা সুসম্পূর্ণ হলে এযুগও বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হবে।

বাংলার টপ্পা

সেকালকার বাংলাগান সম্বন্ধে আজকাল একটা বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এইসব পুরোনো গানের মধ্যে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ঔৎসুক্য প্রকাশ পেয়েছে—সে হচ্ছে 'টপ্পা'। এর একটা প্রধান কারণ এই যে, প্রাচীন টপ্পা গানগুলির মধ্যে কি সুরে কী সাহিত্যে একটা খাঁটি জিনিস আছে, যা সহজ সরল, স্বাভাবিক আর আমাদের একান্ত অন্তরের বস্তু। আজকের সঙ্গীতের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে এই একান্ত স্বাভাবিক এবং আন্তরিক স্পর্শটি নিতান্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে। টপ্পার মনোহারিত্ব আর মর্মস্পর্শী আবেদনের তুলনা হয় না। এরই টানে পুরোনো টপ্পার প্রতি আমাদের আগ্রহ আবার ফিরে এসেছে।

টপ্পার মধ্যে যে সঙ্গীতের দিক থেকে খুব একটা কঠিন ব্যাপার আছে এমন নয়। আন্দোলনযুক্ত তানের মধ্যেই এর বৈশিষ্ট্য। এই তানটি যখন প্রত্যেকটি শব্দের ভিতর দিয়ে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে তখনই সে অন্তরে রসের আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এইখানেই টপ্পার সার্থকতা। যে সূক্ষ্ম রসবোধ থাকলে টপ্পার এই আবেদনটি ফোটানো যায় সেই রসবোধটি যদি না থাকে এবং টপ্পার নিছক টানটিই যদি কণ্ঠস্থ করা যায় তবে যে বস্তু প্রকাশ পাবে তা প্রাণহীন ওস্তাদিয়ানা মাত্র। এই রকম ওস্তাদিয়ানারও অভাব নেই। টপ্পার মধ্যে যেটুকু কঠিন বস্তু তা এই মধুর করুণভাবটি ফুটিয়ে তোলবার মধ্যে নিহিত। টপ্পায় কাব্যের একটি প্রাধান্য আছে। টপ্পায় রসসৃষ্টি করতে হলে এই কাব্যের প্রাধান্যটি অক্ষুণ্ণ রাখা চাই।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এক পুরুষ আগে সুরুচির দোহাই দিয়ে প্রতিপত্তিশালী একদল লোক এই মনোরম সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক অপবাদ দিয়ে গেছেন, যথা—টপ্পা অত্যন্ত ইতর এবং অশ্লীল গান। এই অপপ্রচার এমনি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল যে, লোকে টপ্পা

শুনলেই কানে হাত দিত। অথচ তারও আগে এই টপ্পার প্রতি লোকের আগ্রহের অন্ত ছিল না। প্রাচীন বাংলা গান কী প্রেমের কী ভক্তিরসের—সবই টপ্পার বসে মাখা। বস্তুত প্রধান প্রধান টপ্পা রচয়িতাদের রচনায় অশ্লীলতা তো নেই-ই বরঞ্চ সেই যুগের অপরাপর গানের তুলনায় টপ্পাকেই সর্বাপেক্ষা মার্জিত এবং রুচিসম্পন্ন বলে স্বীকার করতে হয়। টপ্পার মধ্যে এতটুকু ইতরভাব পর্যন্ত নেই। নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, কালী মির্জা প্রভৃতির গান অনুসন্ধান করে দেখুন —এমন পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং মধুর রচনা আপনি বাংলা সাহিত্যেই কম খুঁজে পাবেন। তথাপি এমনি মিথ্যা রটনা হয়েছিল। প্রচারকদের এমনি মহিমা।

বাংলা গানে যখন টপ্পা রচনা আরম্ভ হয় তখন অবশ্য দেশের নৈতিক অবস্থা বিশেষ প্রশংসনীয় নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগের কথা। দেশের চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ চলেছে। একদিকে দারিদ্র্যের করাল মূর্তি অপরদিকে ধনী জমিদারের বিলাস-প্রাচুর্য। দুর্দিনে যেসব দুর্লক্ষণ প্রকাশ পায় সমাজ-জীবনে সেই সবই প্রকট হয়ে উঠেছিল। সুতরাং এইসব অসংযত উচ্ছ্বাস যে তখনকার সঙ্গীত সংস্কৃতিতেও প্রকাশ পাবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নেই। টপ্পার অব্যবহিত পূর্বের কবি, খেউড় প্রভৃতি গানে এইসব ইতর রসিকতার বিরাম ছিল না এবং জমিদারগণ ছিলেন এই সব গানের পৃষ্ঠপোষক।

আমাদের সঙ্গীতের এই দুর্দিনেই নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত সঙ্গীতের সংস্কারসাধনে ব্রতী হন। তিনি শুধু টপ্পার প্রতিষ্ঠাতা নন, বলতে গেলে আধুনিক বাংলা কাব্যসঙ্গীতের প্রথম প্রেরণাও তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। নিধুবাবু জন্মগ্রহণ করেন ১৭৪১ সালে কলকাতায় কুমারটুলীতে এবং তাঁর মৃত্যুও হয় কলকাতাতেই ১৮৩৮ সালে যখন তাঁর সাতানব্বই বছর বয়স। নিধুবাবু সে-যুগের তুলনায় সুশিক্ষিত ছিলেন। সংস্কৃত, ফার্সী ছাড়া ইংরেজি তিনি ভালই শিখেছিলেন।

শেষ জীবনে অবসর সময়ে ইংরেজি বই পড়তেন। এই সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর মার্জিত রচনায় এবং তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁর ব্যবহারিক জীবনেও এই গম্ভীর মার্জিতরুচির উল্লেখ করে গেছেন। কর্মোপলক্ষ্যে নিধুবাবু দীর্ঘদিন ছাপরায় ছিলেন। এইখানেই তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত খুব ভালভাবে শেখেন এবং বহু টপ্পা সংগ্রহ করেন। চাকুরির মেয়াদ শেষ হলে পরিণত বয়সে কলকাতায় এসে তিনি এইসব টপ্পার সুর ছড়িয়ে দিলেন বাংলা গানের মাধ্যমে।

এখানে বলে রাখা উচিত যে, নিধুবাবুর টপ্পা আর পশ্চিমী টপ্পা এক জিনিস নয়। পশ্চিমী টপ্পায় তানের কাজটা খুব দ্রুত কিন্তু নিধুবাবু এই তানে এক একটি সুরের ওপর একটা আন্দোলনের ভাব নিয়ে এলেন যাতে করে টপ্পার করুণ রসটি মূর্ত হয়ে ওঠে। বাংলা টপ্পার এই বৈশিষ্ট্যই পরবর্তীকালের রচয়িতাগণ গ্রহণ করেছেন।

নিধুবাবুর পরে টপ্পা রচনায় যাঁরা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীধর কথক এবং কালী মির্জার নাম সর্বাগ্রেই মনে আসে। বস্তুত বাংলা টপ্পার প্রধান রচয়িতা এই তিন জন—নিধুবাবু, শ্রীধর কথক এবং কালী মির্জা। নিধুবাবুর রচনা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে নানা স্থানে প্রবন্ধাদি বেরিয়েছে কিন্তু শ্রীধর কথক এবং কালী মির্জার গান-গুলি এ যুগে তেমন প্রচার লাভ করে নি। সঙ্গীত রচনায় শ্রীধর কথকের দক্ষতা ছিল অসামান্য। এমন কয়েকটি গান আছে যা শ্রীধরের রচনা কি নিধুবাবুর সে বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে বলা মুশকিল। উদাহরণস্বরূপ 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে' গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলার টপ্পায় এই গানটি একটি অমূল্য সম্পদ।

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু মুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই তোমায় দেখতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥

গানটির অবশ্য অনেক ভাষান্তর আছে। এটি একটি প্রাচীন গীত-

সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল। শ্রীধর কথকের আরও দু'-একটি গান তুলে দিলুম এবং এর থেকেই বোঝা যাবে তাঁর রচনা ছিল কত মর্মস্পর্শী। আজও যেসব প্রাচীন ব্যক্তি এসব গান গেয়ে থাকেন তাঁদের কাছে সুরসহযোগে এগুলি শুনলে এদের মনোহারিত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারা যাবে।

সিন্ধু—আড়ঠেকা

যাবত জীবন রবে কারেও ভালবাসিব না।
ভাল বেসে এই হল ভালবাসা কি লাঞ্ছনা॥
আমি ভালবাসি যারে, সে কভু ভাবে না মোরে।
তবে কেন তারি তরে নিয়ত পাই এ যন্ত্রণা॥
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারেও ভালবাসে না॥

খাম্বাজ—মধ্যমান

এমন যে হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না।
এ চিতে নিশ্চিত ছিল পিরীতে বিচ্ছেদ হবে না॥
ভেবেছিলাম নিরন্তর, হয়ে রব একান্তর,
যদি হয় কথান্তর, মতান্তর তায় হবে না॥
এখন হল অন্তর, পিরীতি হল অন্তর
আঁখি ঝরে নিরন্তর প্রাণান্তর তায় হবে না॥

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা

হায় কি লাঞ্ছনা কি গঞ্জনা ভেবে তো প্রাণ বাঁচে না।
সে গেছে তার প্রেম গেছে আমার তো পিরীত গেল না॥
কবার নয় কব কার কাছে, যে দুখে ভাসায়ে গেছে,
আমার মনেতে সে যে বিনা সূতে গাঁথা আছে
পিরীতের যে রীতি আছে তার মতন সে করে গেছে
চিহ্নমাত্র রেখে গেছে লোকে কলঙ্ক ঘোষণা॥

শ্রীধর কথক বাংলা ১২২৩ সালে হুগলীর বাঁশবেড়েতে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীধরের পিতামহ লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ ছিলেন একজন নামকরা কথক। কথক হিসাবে শ্রীধরও নাম করেছিলেন যথেষ্ট। কথকতা তিনি শিখেছিলেন বহরমপুরের কালীচরণ ভট্টাচার্য নামক এক কথকের কাছ থেকে। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর দখল থাকলেও যৌবনে কবি এবং পাঁচালীর দলের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল একটু বেশি। কবি বা পাঁচালীতে তাঁর দান কতখানি ছিল তা বলবার উপায় নেই তবে তাঁর যেসব গান আমরা পেয়েছি তা সবই টপ্পার অন্তর্ভুক্ত।

কালী মির্জা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই সঙ্গীতে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ছিলেন গুপ্তিপাড়ার অধিবাসী। কালী মির্জা সঙ্গীতে অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন এবং সেকালে সুদূর কাশী, লখনউ এবং দিল্লীতে থেকে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। কিছুকাল বর্ধমানে কাটাবার পর তিনি কলকাতায় এসে গোপীমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন এবং এখানে তিনি বিশেষ গৌরবে অধিষ্ঠিত হন। জীবনের শেষভাগ তিনি কাশীতেই যাপন করেছিলেন। ১৮২৫ সালের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কালী মির্জা নানা বিষয়ে গান রচনা করেছেন! কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব 'সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম' গ্রন্থে তাঁর বহু গান সন্নিবেশিত করেছেন। তবে এটা ঠিকই যে কালী মির্জার স্থান নিধুবাবু এবং শ্রীধর কথকের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নে। এর প্রধান কারণ তাঁর রচনায় কাব্যাংশ তত উৎকৃষ্ট নয়, দ্বিতীয়ত অনুপ্রাসের প্রাবল্যে কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একটি গান উদ্ধৃত করি—

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া

পরে যে পরের তরে বৃথায় যতন করে।
আপনা ভাবিয়ে পরে আঘাত প্রাণের পরে॥
পরশ জানিয়ে পরে, সুখী হয় পরস্পরে,
বুঝিতে নাহিক পারে কি হবে তাহার পরে॥

অন্য ধরনের সুন্দর রচনাও তাঁর আছে। তারও একটি উদাহরণ দেওয়া গেল—

সর্ফর্দা—আড়া

বাসনার কি বাসনা তবু তারে ভালবাসে।
ভানু লক্ষান্তরে থাকে কমল সলিলে ভাসে॥
চক্রবাক চক্রবাকী, কি সুখে তাহারা সুখী,
নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি কেহ নাহি কারো পাশে॥

বৈঠকী টপ্পা রচনার ক্ষেত্রে প্রথম যুগে যাঁরা প্রাধান্যলাভ করেন তাঁদের মধ্যে এই তিনজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও ১৮২০ সাল থেকে আরো অনেকে টপ্পা রচনায় প্রশংসা অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে আশুতোষ দেব [ছাতুবাবু], রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন রায়, দয়ালচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অনেকেই বহু গান রচনা করেছেন। অবশ্য সকলেই কেবলমাত্র টপ্পা রচয়িতা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ বর্তমান। টপ্পার এই বিরাট প্রভাবটি পরবর্তী যুগেও চলে এসেছে এবং তারই ফলে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় টপ্পার স্পর্শ বিজড়িত হয়ে আছে।

এ তো গেল টপ্পা রচয়িতাদের কথা। টপ্পার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি বোধ করি তার উপায়ও নেই। ধ্রুপদ, খেয়ালের মত টপ্পাও সাঙ্গীতিক প্রেরণা থেকেই প্রচলিত সঙ্গীত রীতি থেকে সংগঠিত হয়েছে। কাপ্তেন উইলার্ড বলেছেন টপ্পা ছিল রাজপুতনার উষ্ট্রচালকদের গীত। কাপ্তেন সাহেবের এই মতবাদ কতখানি সত্য তা নির্ধারণ করবার ক্ষমতা আমাদের নেই আর তা ছাড়া আমাদের সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে বিচার করবার মত সঙ্গীতবোধ তাঁর বিশেষ ছিল বলেও মনে হয় না। তবে আমাদের ব্যবহারিক সঙ্গীত সম্বন্ধে ইউরোপীয় স্কলারদের যেরকম ধারণা তাঁদের নানা রচনায় দেখেছি তাতে তাঁদের বিচারবুদ্ধির ওপর খুব আস্থা স্থাপন না

করাই ভাল। উইলার্ড তাঁর A Treatice on the Music of Hindoostan লিখেছিলেন ১৮৩৪ সালে। টপ্পার সূত্রপাত হয়েছে তারও প্রায় শ' খানেক বছর আগে। উইলার্ড যে কি করে খবর পেলেন রাজপুতানার উষ্ট্রচালকরা টপ্পার প্রবর্তক সেটি গভীর রহস্যে আবৃত। এই সব মতের ওপর অনেক গুরুত্ব এক সময় দেওয়া হয়েছে এখন আর সে ভ্রান্তির প্রশ্রয় না দেওয়াই সমীচীন।

হিন্দীতে টপ্পা শব্দটার অর্থ হচ্ছে লাফিয়ে যাওয়া। টপ্পায় এই যে তানের কাজ, এ যেন এক স্বর থেকে আর এক স্বরে চটুলভাবে টপ্‌কে টপ্‌কে যাওয়া,—এ থেকেও টপ্পা কথাটা এসে থাকতে পারে। যাই হোক, টপ্পাকে আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত হালকা গানের মধ্যেই ধরা হয়েছে, যদিচ টপ্পায় বেশ বিলম্বিত তালই ব্যবহৃত হয়, যার সঙ্গে বড় খেয়ালও গাওয়া যেতে পারে। টপ্পার উপযোগী কতকগুলি বিশেষ রাগ আছে—যেমন ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, কালাংড়া, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোয়া প্রভৃতি। এগুলিতে টপ্পার স্বাভাবিক করুণ রসটি বিলক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে। টপ্পায় অবশ্য সবরকম গানই আছে, তবে প্রেমের গান, বিশেষ করে বিরহকে অবলম্বন করেই অধিকাংশ টপ্পা এ পর্যন্ত রচিত হয়েছে।

টপ্পাকে রঙিন গান বা হালকা গান বলে ধরলেও একে বরাবর বৈঠকী গানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আগেকার দিনে টপ্পার স্থান ছিল আখড়াই গানের আসরে, আর আখড়াই গান বলতে বেশ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতই বোঝাতো, যার সঙ্গে কাব্যসম্পদও ছিল যথেষ্ট। পরে আখড়াই গান ভেঙে হাফ-আখড়াই হোলো এবং আরও কয়েকটি শাখা-প্রশাখাতেও যে আমাদের গান বিভক্ত না হয়েছিল তা নয়। নিধুবাবুর জীবদ্দশাতেই এসব ঘটে। সঙ্গীতকে ক্রমশ হালকা করে সাধারণের কৌতুকের খোরাক হিসাবে তুলে ধরাতে তাঁর যথেষ্ট আপত্তি ছিল এবং এই কারণেই বোধ হয় যখন টপ্পায় খেমটা ধরনের গানের

প্রাবল্য দেখা গেল, তখন তিনি ধীরে ধীরে এইসব ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

টপ্পা আমাদের গৌরবের বস্তু এই কারণে যে, টপ্পায় বাঙালী শিল্পীর স্বকীয়তার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। বস্তুত বাংলা টপ্পা অনেক মার্জিত এবং বিশেষত্বসম্পন্ন, যার মধ্যে প্রাচীন রীতির সঙ্গে নবীন রীতির একটা সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে।

ঠুংরির চেয়ে টপ্পায় গুণপনা দেখাবার সুযোগ কম তো নয়ই, বরঞ্চ বেশিই। লয়ের কৌশল টপ্পায় অনেক বেশি দেখানো যায়, আর তার সঙ্গে তানের বৈচিত্র্য। এক একটি শব্দের ওপর ছোট ছোট তান সহযোগে বা গমকের সঙ্গে যে অপরূপ ছন্দের হিল্লোল তোলা যায়, আর কোনও রীতিতেই বোধ হয় সেই কাজটি দেখানো সম্ভব নয়। আমাদের শিল্পীরা ছোট খেয়াল বা ঠুংরিতে শেষ পর্যন্ত দ্রুত লয়ে প্রায় কাহারবায় এসে পৌঁছে বহু কৃতিত্ব প্রদর্শন করে থাকেন। তাতে বাহবা মেলে বটে, কিন্তু তার সাঙ্গীতিক মূল্য খুব বেশি নয়। টপ্পায় এইরকম অবতরণিকা প্রস্তুত হয় নি! বিলম্বিত থেকে সুললিত মধ্য-লয়ে একটি প্রশান্ত অবস্থায় এসে এর পরিণতি এবং সঙ্গীতে এইটাই স্বাভাবিক।

সঙ্গীতবিদ্যা বা Musicology

প্রত্যেক প্রয়োগ শিল্পে অবতীর্ণ হ'তে গেলে আগে থেকে প্রয়োগ-তত্ত্বটি জানা দরকার। এই তত্ত্বটিই হ'চ্ছে আসল বিদ্যা। অশিক্ষিত পটুত্বের বলে যথেষ্ট বিদ্যা অর্জন না ক'রেও প্রয়োগ শিল্পে কিঞ্চিৎ দক্ষতা অর্জন করা যায় বটে কিন্তু এ দক্ষতার মূল্য থাকলেও গুরুত্ব নেই —তাই আজকাল সবক্ষেত্রেই বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়ে যাঁরা কলকব্জা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁরা মিস্ত্রীগিরির ওপরে পৌঁছোতে পারেন না—চিকিৎসাবিদ্যা না জেনে যাঁরা ওষুধ দিয়ে থাকেন তাঁদের লোকে হাতুড়ে ছাড়া আর কিছু বলেন না। এই দুনিয়ায় কেবলমাত্র মিস্ত্রী আর হাতুড়ে নিয়ে কোন-ক্রমেই কাজ চলতে পারে না—সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এবং সুবিজ্ঞ চিকিৎসক চাই। অতএব সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সঙ্গীতবিদ্যায় জ্ঞানলাভ করা এবং পারদর্শিতা অর্জন করা বিশেষ প্রয়োজন নতুবা কেবলমাত্র নকলনবীশ হিসাবেই পরিচিত হবেন আর কিছু নয়। আমাদের দেশে গাইয়েরা প্রধানত এইরকম নকলপনায় অভ্যস্ত বলেই সঙ্গীতবিদ্যা তেমন অগ্রসর হয় নি, কতকগুলি বাঁধাধরা প্রয়োগের মধ্যেই আটকে গেছে। কিন্তু এভাবে অগ্রসর হবার দিন আর নেই, সঙ্গীতবিদ্যার সম্প্রসারণ ঘটতে বাধ্য এবং সূচনাও ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য জগতে সঙ্গীত-বিদ্যার বিপুল সম্প্রসারণ ঘটেছে যার ফলে এখন সঙ্গীতবিদ্যাকে "Musicology" আখ্যা দিয়ে অপরাপর বিদ্যার সমশ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। আমাদের দেশে এই কাজটি এখনও বাকী আছে অতএব অবিলম্বে সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধীয় ব্যাপক কার্যে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন।

এইপ্রকার প্রচেষ্টার প্রথম উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল গত শতাব্দীতে এই বাংলা দেশেই। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীতশাস্ত্রের বহু সংকলন সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সঙ্গীতসারসংগ্রহ

একটি মূল্যবান গ্রন্থ। অল্পের মধ্যে সঙ্গীতের সকল বিভাগ সম্বন্ধে ধারণা দেবার পক্ষে এমন একটি উত্তম গ্রন্থ দুর্লভ। সৌরীন্দ্রমোহনের আর একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হ'চ্ছে 'যন্ত্রকোষ'। এ বইটি ১৮৭৫ সালে বাংলায় রচিত হয়েছিল। কোষগ্রন্থের দিক থেকে বাংলার সঙ্গীত বিদ্যায় এইটিই একমেবাদ্বিতীয়ম্ বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য ইংরেজি বা অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য কোষগ্রন্থের তুলনায় এ গ্রন্থ অতিশয় নগণ্য এবং তথ্যের দিক থেকে ভুল ভ্রান্তিও যে না মেলে এমন নয় কিন্তু তথাপি যে উদাহরণ তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সেই উদাহরণ অনুসরণ করলে আজ বাংলা ভাষায় যন্ত্রসঙ্গীত সম্বন্ধে একটি বিরাট অভিধান প্রস্তুত করা যেত। এই গ্রন্থে মাত্র ২৯৬ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য বহু যন্ত্রের উল্লেখ এবং বর্ণনা দেওয়া আছে। লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র থেকে আরম্ভ করে প্রাচীনকালে সর্বদেশে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান প্রায় সব যন্ত্রেরই উল্লেখ এবং বর্ণনা আছে এই গ্রন্থে। এইটিকে ভিত্তি করে আজকে যদি যন্ত্রসঙ্গীতের একটি সম্পূর্ণতর কোষগ্রন্থ সংকলন করা যায় তবে একটি মহৎকার্য সম্পাদিত হবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। শুধু বাংলা ভাষায় নয় ভারতীয় অপরাপর ভাষাতেও যন্ত্রসঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য সংকলন নেই। বস্তুত যন্ত্রসঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা আদৌ কোন গুরুত্ব প্রদান করি নি —এই কারণে যন্ত্রসঙ্গীত সম্বন্ধে কোন বিবরণ প্রদান করতে গেলে আজকালকার দিনে শাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দগুলি বুঝতে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়। বর্তমানে একটি প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত বাদ্যযন্ত্রাদির সংকলন। কিন্তু কেবলমাত্র বর্ণনা থাকলেই চলবে না। যন্ত্রগুলির সচিত্র পরিচয়ও থাকা উচিত যেমনটি ছিল C. R. Dey-র The music and musical instruments of South India নামক গ্রন্থে। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র বর্তমানে আর মেলে না, কিন্তু তাদেরও চিত্র পরিকল্পনা করা যায় শাস্ত্রীয় বর্ননা থেকে। এই চিত্রগুলি সুপরিস্ফুট হ'লে বাদ্যযন্ত্রের বিবর্তন বোঝা সুসাধ্য হয়ে উঠবে। লোকসঙ্গীতে, বা

বিভিন্ন যাযাবরজাতীয়দের মধ্যে বহু বাদ্যযন্ত্র এখনও প্রচলিত আছে যা বহুপ্রাচীনযুগের বাদ্যযন্ত্রের স্মৃতি বহন করছে। এইগুলির যথোচিত সংগ্রহ থাকা উচিত মিউজিয়ামগুলিতে এবং এইসব বাদ্যের চিত্রসম্বলিত পুস্তিকাও প্রকাশিত হওয়া উচিত। কলকাতার মিউজিয়াম বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহের দিক দিয়ে অনেক পেছিয়ে আছে—এইদিকে এঁদের কোন প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না।

সাধারণ সঙ্গীত সম্বন্ধে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ১৮৬৯ সালে সঙ্গীতসার নামক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটিতে অনেক কিছু আছে কিন্তু ভুল ভ্রান্তিও প্রচুর। তা সত্ত্বেও গ্রন্থটি পঠিত হওয়া কর্তব্য কেননা জানবার জিনিসও এতে অনেক রয়েছে।

সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে একটি সার্থক গ্রন্থ রচনা করেন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৫ সালে। এই বহুল প্রচলিত গ্রন্থটির নাম গীতসূত্রসার। বর্তমানে এই একমাত্র পুরাতন গ্রন্থ যা সুসম্পাদিতভাবে বাজারে পাওয়া যায়। হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এই গ্রন্থে যে পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে সেটি বিশেষ মূল্যবান। আগ্রহশীল পাঠক যদি ধৈর্যসহকারে এই বিরাট পরিশিষ্টটি পাঠ করেন তবে সঙ্গীতবিষয়ক বহু কৌতূহলের নিরসন হবে।

সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে গত শতাব্দীতে বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন রামদাস সেন। তাঁর লিখিত 'হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়,' 'ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র,' 'সঙ্গীত শাস্ত্রানুগ নৃত্য ও অভিনয়,' 'স্বর-বিজ্ঞান,' 'রাগনির্ণয়' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সেকালে আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রচুর আলোকপাত করেছিল। আজও এই প্রবন্ধগুলি পড়তে ভাল লাগে এবং সেকালের মুক্ত ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধীয় আমাদের বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থটির কথাই এ পর্যন্ত বলা হয় নি। এটি কাব্যগ্রন্থ—নাম—'সঙ্গীত-তরঙ্গ,' রচনা করেছিলেন রাধামোহন সেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে যে পদ্ধতিতে সঙ্গীত

সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছে এই রচনাটিতেও অনুরূপ রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে স্বরাধ্যায় এবং রাগাধ্যায় বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীও সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থকার বহু শাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে ভূমিকার কিঞ্চিত উদ্ধৃত করছি।—

"সঙ্গীত বিদ্যার বহুতর গ্রন্থ হয়।
ভারতের ভাষা করা যুক্তিমত নয়॥
অতএব কতগুলি গ্রন্থকে ভাঙ্গিয়া।
প্রকাশ করিব আমি নানা ভাষা দিয়া॥
সংস্কৃত আদি তাতে যে সব বচন।
গদ্যপদ্যরূপে তাহা করিব রচন॥
সোমেশ্বর মত আদি যত মত আছে।
শ্রেণীমত না রচি রচিব আগে পাছে॥
হিন্দুস্থান অবধি করিয়া নানা দেশ।
কলিকাতা পর্য্যন্ত বা বাংলার শেষ॥
হিন্দুস্থানি লোক কি বাঙ্গালী লোক যত।
সকলের অতিগ্রাহ্য হনুমান মত॥
তত্রাপি রচিব আমি এরূপ নিয়মে।
নাদ পুরাণের মত প্রকাশ প্রথমে॥
মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য মত প্রকাশিব।
সর্বশেষে হনুমান মত বিরচিব॥

* * *

সঙ্গীতদর্পণ আর দেখ দামোদর।
রত্নাকর মকরন্দ রূপ রত্নাকর॥
মান কুতূহল সভা বিনোদ সঙ্গীত।
পারিজাতক প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত॥"

এছাড়াও তোহফোৎ-উল্-হিন্দ প্রভৃতি পার্সী গ্রন্থাদি থেকেও নানা জিনিস গ্রহণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। সাঙ্গীতিক তথ্যাদি ছাড়াও ছন্দ বৈচিত্র্যের জন্য এই গ্রন্থটি উপভোগ্য। ভারতচন্দ্রের ঢঙে নানা ছন্দের অবতারণা করে এর কাব্যসম্পদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই গ্রন্থটি ছাপা হয় বাংলা ১২৫৬ সালে অর্থাৎ একশো পাঁচ বছর আগে,—ইংরেজি ১৮৫০ সাল বরাবর। গ্রন্থের রচনাকাল আরও বেশ কিছু পূর্বে। রাধামোহন সেনের মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে আদিনাথ সেনের অনুমতি অনুসারে গ্রন্থটি ছাপা হয়।

বাংলার সঙ্গীত সাহিত্যে রাধামোহন সেনের 'সঙ্গীত-তরঙ্গ' একটি অতি বিশিষ্ট গ্রন্থ কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থটি এখনও অনাদরেই পড়ে আছে। এই সব অবহেলা থেকেই বোঝা যায় প্রকৃত সঙ্গীতালোচনা সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ কত কম।

গত শতাব্দীতে সঙ্গীত রত্নাকরের স্বরাধ্যায়, সঙ্গীত পারিজাতের স্বর-রাগাধ্যায় এবং সঙ্গীত-দর্পণের স্বর-রাগাধ্যায় কলকাতা থেকে সম্পাদিত হয়ে ছাপা হয়েছিল,—কিন্তু বাংলায় নয় সংস্কৃতে। বলা বাহুল্য সরল এবং সুখপাঠ্য বাংলায় এই সব গ্রন্থের মূলসহ অনুবাদ হওয়া অবশ্যই উচিত কিন্তু আমাদের সঙ্গীত জগতের এসব ব্যাপারে যেরকম উৎসাহ তাতে উৎসাহী ব্যক্তিদেরও এসব কাজে হাত দিতে ত্রাসের সঞ্চার হয়।

এযুগে এবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়। তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ নানা মাসিক পত্রে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। সেগুলি সংকলিত হ'লে একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হ'তে পারতো।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এই অভাব অনেকটা মিটিয়েছেন। তাঁর বিপুল পরিশ্রমের ফলস্বরূপ 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থটি গবেষকদের বহু অভাব মোচন করবে।

বিমল রায় মহাশয়ও সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ

লিখেছেন। এই সব সুচিন্তিত রচনা আমাদের সঙ্গীতালোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে।

অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অপূর্ব সুখপাঠ্য রচনাগুলিও এযুগের সঙ্গীত সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। এমন মনোরম রচনাভঙ্গী সঙ্গীতের মত টেকনিক্যাল বিষয়ে সুদুর্লভ। তাঁর 'প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তা' আয়তনে ক্ষুদ্র কিন্তু বিষয়বস্তুর সুনিপুণ বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এমন একখানি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান রচনা যে-কোন দেশের সঙ্গীত সাহিত্যেই বিরল।

এই প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের নাম না উল্লেখ করলে রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বস্তুত এযুগে সাঙ্গীতিক চেতনার মূলেই রয়েছেন দিলীপকুমার। শুধু তাই নয় সঙ্গীতালোচনাকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন তিনি। "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা" প্রভৃতি নানা প্রবন্ধে তিনি বহু পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীতবিদগণের সঙ্গে বাংলার পরিচয়সাধন করেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে যখন বাংলায় স্বল্প পরিচিত তখন দিলীপকুমার তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে তাঁর কার্যাবলীর ব্যাখ্যা করেন। সঙ্গীতের প্রয়োগ শিল্পী সম্বন্ধে চিন্তার বিবিধ বিষয়বস্তু তাঁর প্রবন্ধাদিতে এবং গীতশ্রী, সাঙ্গীতিকী, তীর্থঙ্কর, সুরবিহার প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে। এত ব্যাপকভাবে সঙ্গীতালোচনা আমাদের দেশে ইতিপূর্বে আর কেউ করেন নি

দিলীপকুমার সঙ্গীতে উদারনৈতিক। আমাদেব সঙ্গীতের মূল বৈশিষ্ট্য যে সুরবিহারে একথা তিনি বহুভাবে ঘোষণা করেছেন এবং কাব্য-সঙ্গীতে যদি শিল্পীকে সুরকারের নিছক তাঁবেদার হতে হয় তবে আমাদের সঙ্গীতের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য একথা তাঁর চেয়ে জোর দিয়ে আর কেউ বলেন নি। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকের মতান্তরও হয়েছে। কিন্তু, আজকের যুগের আবৃত্তিসার কাব্য-সঙ্গীত শুনে তাঁর সাবধানবাণী কতখানি সত্য সেটা আমরা উপলব্ধি করছি। দিলীপ-

কুমার শুধু বলেই ক্ষান্ত হন নি, নিজে গেয়ে বা শিষ্য শিষ্যাদের দিয়ে গাইয়ে তাঁর মতবাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছেন।

বর্তমান যুগে সঙ্গীত সম্বন্ধে যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন তাঁদের মধ্যে ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত সঙ্গীত-সাহিত্যকে গড়ে তোলবার মূলেও তাঁর প্রচেষ্টা রয়েছে।

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীও সঙ্গীতশৈলী সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধাদি লিখেছেন। আমাদের স্বরলিপি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা এবং প্রাচীন বাংলা গানের পুনরুদ্ধারকল্পে প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে ব্যাপক চিন্তার ফলে তিনি বাংলা গানকে সমগ্রভাবে দেখেছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর উদার মতাবলম্বী রচনায় চমৎকার সাহিত্যরসও বর্তমান।

আরও অনেকে সঙ্গীত সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। বিষয়টি এত ব্যাপক যে সবাইকার সম্বন্ধে উল্লেখ করা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় আলোচনা কিভাবে চলেছে তার সংক্ষিপ্ত এবং মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হ'ল মাত্র।

স্বরলিপি সমস্যা

আজকাল মাঝে মাঝে নানাধরনের স্বরলিপির বই হাতে আসে—কোনটা উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের কোনটা কাব্যসঙ্গীতের। বেশির ভাগ বইতেই কিন্তু স্বরলিপিগুলি যথাযথ হতে দেখি না, কোনক্রমে স্বরগ্রাম দিয়ে বুঝিয়ে দিলেই হোলো—অনেক লিপিকারের এইরকম ধারণা আছে বলে মনে হয়। আমাদের দেশে আজকাল দু'রকমের স্বরলিপির ব্যবহার হচ্ছে, একটা আকারমাত্রিক আর একটা ভাতখণ্ডে প্রবর্তিত কসিমাত্রিক রীতি। এই কসিমাত্রিক পদ্ধতিতে লিখিত কাব্যসঙ্গীতের গ্রন্থও দেখেছি দু'একটা কিন্তু কাব্যসঙ্গীতে ভাতখণ্ডে প্রবর্তিত রীতির পক্ষপাতি আমি নই, তার কারণ আকারমাত্রিক স্বরলিপি বিচার ক'রে দেখলে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নাই। ভাতখণ্ডের স্বরলিপি আমাদের আকারমাত্রিকেরই একটা প্রকার-ভেদ বা modification, যদিও তিনি কসির সাহায্যে কোমল স্বর এবং মাথায় দাঁড়ি বসিয়ে কড়ি মধ্যমকে দাঁড় করিয়েছেন।

আকারমাত্রিকের চড়ার রেফের বদলে তিনি দিয়েছেন মাথায় ফুটকি আর খাদে নিচের হসন্তের জায়গায় তলায় ফুটকি। আকার-মাত্রিকের আর যে সমস্ত সূক্ষ্ম অংশ আছে সেগুলি তাঁর স্বরলিপিতে দেখা যায় না বোধহয় প্রয়োজনও হয় না কেননা উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের স্বরলিপিতে মূল কাঠামোটা দেখালেই যথেষ্ট হয়, প্রত্যেকটি উচ্চারণ বা সূক্ষ্ম অংশ বিশেষ করে না দেখালেও চলে।

অনেক আগেকার প্রচলিত কসিমাত্রিক, সাংখ্যমাত্রিক এবং দণ্ড-মাত্রিক স্বরলিপিতে যেসব ত্রুটি এবং অসুবিধা ছিল সেগুলি দূর করে আকারমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। বহুদিক বিচার করে এবং বহু চিন্তার ফলে যে এই স্বরলিপির প্রবর্তন হয়েছে এটা সহজেই বোঝা যায়, কেননা আমাদের গানের যে-কোন

প্রকাশ বা উচ্চারণভঙ্গি অনায়াসে দেখানো যায় আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে। আর, তা ছাড়া আকারমাত্রিক কী উচ্চাঙ্গ কী কাব্যসঙ্গীত উভয়ের পক্ষেই সমান প্রযোজ্য। মোট কথা সবদিক দিয়ে স্পষ্টত্বই হচ্ছে আকারমাত্রিকের সবচেয়ে বড় গুণ। আকারমাত্রিকে কোমল স্বরগুলি শুদ্ধ স্বরের তলায় কসি না দিয়ে একেবারে অন্য অক্ষর দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এতে করে ছাপার ভুলে যে বিপদের সম্ভাবনা হতে পারত সেটা কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাতখণ্ডে 'ধ'এর তলায় কসি দিয়ে কোমল ধৈবতকে প্রকাশ করেছেন, আকারমাত্রিকে সেটা করা হয়েছে "দা" এই অক্ষর দিয়ে। কোনরকমে যদি "ধ"-র তলার কসিটা বাদ পড়ে যায়, তাহলেই সমস্ত স্বরলিপিটা গোলমেলে হয়ে উঠবে, কিন্তু কোমল ধৈবত বোঝাতে যদি সম্পূর্ণ একটি অন্য অক্ষর (উচ্চারণের দিক দিয়ে কাছাকাছি) ব্যবহার করা হয়, তাহলে এরকম সম্ভাবনাই থাকে না। আবার নিচে ফুটকি বা ওপরে ফুটকিটাও খুব একটা স্পষ্ট সংজ্ঞা নয়, এর চেয়ে রেফ বা হসন্ত চিহ্ন অনেক স্পষ্টতর। বাংলায় হসন্তের প্রয়োগটা বেশি এবং আকারমাত্রিকে হাইফেন দিয়ে এই উচ্চারণটি দেখিয়ে দেওয়া হয়—কসিমাত্রিক স্বরলিপিতে এই ব্যবস্থা নেই। আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে তালবিভাগ অনেক পরিচ্ছন্নভাবে অথচ সংক্ষেপে দেখান যায়, প্রত্যেকটা ভাগের নিচে সোম, তাল, ফাঁক প্রভৃতি অনবরত দেখিয়ে দেবার দরকার হয় না।

অতএব সব দিক দিয়ে চিন্তা করে আকারমাত্রিক স্বরলিপিই আমাদের দেশে সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া উচিত। অনেকে আবার পুরোপুরি একটা রীতি গ্রহণ করেন না—একটার মধ্যে আর একটা চিহ্ন এনে এবং তাতে নিজস্ব পদ্ধতি খানিকটা মিশিযে স্বরলিপিকে দুর্বোধ্য করে তোলেন এতে এইটাই বোঝায় যে স্বরলিপিকার কোন একটা রীতির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নন। কেউ কেউ দেখেছি আকারমাত্রিক স্বরলিপি অত্যন্ত কাঁচাভাবে প্রস্তুত করেন, যাতে খানিকটা জায়গা

অনর্থক নষ্ট হয়। যেমন ফাঁক থেকে গানটা ধরা হচ্ছে বলে তার আগে ১ । + ।৩। এরকম তালের চিহ্ন দিয়ে তারপর গানটা আরম্ভ করলেন। একটু কৌশল করে স্বরলিপি করলে এই রকম কোন তালের ঘর ফাঁকা রাখবার দরকার হয় না। আকারমাত্রিক স্বরলিপি সম্বন্ধে যাঁদের সন্দেহ আছে তাঁরা বিশ্বভারতী প্রকাশিত স্বরলিপিগ্রন্থ-সমূহের সাহায্য নিতে পারেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে সমস্ত স্বরলিপি স্বরবিতান গ্রন্থসমূহে মুদ্রিত হয়েছে এইগুলিতে আকারমাত্রিক স্বর-লিপির যথাযথ রূপ পাওয়া যায় এবং এই সব স্বরলিপি থেকে অনায়াসে বোঝা যায় কত সুন্দর, সহজ আর সংক্ষেপে এই পদ্ধতিতে সমস্ত সুরটি বোধগম্য হয়।

স্বরলিপি কথাটি নিয়েও কারুর কারুর সন্দেহ আছে বলে মনে হয়। একজন একটি গ্রন্থে স্বরলিপিব পরিবর্তে সুরলিপি শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর বোধহয় ধারণা যে আমরা যখন সুরটাকেই প্রকাশ করছি, তখন স্বরলিপি বলব কেন, বলা উচিত সুরলিপি। এক্ষেত্রে লেখক মূলেই ভুল করেছেন—সুরটাকেই আমরা প্রকাশ করি বটে, কিন্তু আমরা যেটা লিপিবদ্ধ করি, সেটা এক একটা স্বর, এই সব স্বর মিলিয়েই একটা সুর হোল। সা, রে, গা, মা আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটাই এক একটা স্বর—অতএব আমরা যখন স্বরকেই লিপিবদ্ধ করছি তখন "স্বরলিপি" এই সংজ্ঞাটিই ঠিক, "সুরলিপি" নয়।

স্বরলিপির প্রসঙ্গে আর একটা কথা না বলে পারছি না যে, স্বর-লিপির বই বছরে কয়েকখানা করে বেরুলেও এখনও আমাদের দেশে স্বরলিপির আরও অনেক বেশি প্রচলন হওয়ার প্রয়োজন। এখনও অনেক গায়ক আছেন, যাঁরা স্বরলিপি জানেন না বা স্বরলিপির ওপর তাঁদের কোন আস্থা নেই, এমনকি শিষ্যবর্গের কাছে অনেক গুরু স্বরলিপির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেও থাকেন। আমাদের সঙ্গীতের শ্রুতিই নাকি প্রধান এবং কান দিয়ে না শিখে স্বরলিপি দেখে শিখলে

সে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য—শুধু তাই নয়, সে শিক্ষা নাকি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। বস্তুত এই ধরনের লোকের জন্যই আমরা সঙ্গীতে বহু বস্তু হারিয়েছি। নিজেদের পুঁজি তো তাঁরা কখনও কাউকে তুলে দিয়ে যানই না উল্টে অপরে যদি লুপ্ত জিনিস পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করেন বা প্রাপ্ত বস্তু রাখতে চান তাহলে এইভাবে তাঁদের প্রচেষ্টায় বাধা দিতে থাকেন। ভাগ্যক্রমে এঁদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে, কিন্তু তেমনভাবে স্বরলিপি করবার আগ্রহ আমাদের দেশে বাড়ছে না। সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ, নিখুঁত বা চলনসই যেরকমই হোক না কেন, স্বরলিপি করে রাখলেই সঙ্গীত থাকবে, নইলে ক্রমেই মুখে মুখে বিকৃত হতে থাকবে এবং অবশেষে হয় লুপ্ত হয়ে যাবে নইলে পাল্টে গিয়ে রূপান্তর ঘটবে। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের স্বরলিপি হয়েছিল বলে সেগুলি রয়ে গিয়েছে আর দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুলের অনেক গানের স্বরলিপি হয় নি বলে সেগুলির 'সুর আর পাবার উপায় নেই। অধিকাংশ পুরানো রেকর্ড পাওয়া যায় না যে, তার থেকে স্বরলিপি করে রাখা যাবে। এখনো কয়েকজন আছেন যাঁরা বহু প্রাচীন বাঙলা গান জানেন, কিন্তু তাঁরা এসব গানগুলির স্বরলিপি না রেখে গেলে কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সব গানের সুর আর কারুর জানবার উপায় থাকবে না।

আকারমাত্রিক স্ববলিপি সম্পূর্ণভাবে করতে জানা যেমন দরকার তেমনি প্রয়োজনীয় কর্তব্য হচ্ছে প্রাচীন বিভিন্ন স্বরলিপিতে লিখিত ভাল ভাল গানকে আকারমাত্রিকে পুনর্মুদ্রণ। শুধু গানই নয় সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক আলোচনাও দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে আছে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত "রাগের গঠন শিক্ষা" নামক উত্তম পুস্তকটির উল্লেখ করা যায়। রাগের রূপ সম্বন্ধে এমন বিশ্লেষণ এবং আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ বাংলায় (শুধু বাংলায় কেন ভারতীয় সঙ্গীতে) আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। তিনি একশ' সাতটি রাগের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন;

কিন্তু প্রকাশ করে যেতে পেরেছিলেন মাত্র বত্রিশটি রাগের গঠন প্রণালী! অবসরের অভাবে অবশিষ্ট রাগগুলির গঠনপ্রণালীর পাণ্ডু-লিপিও তিনি রেখে যেতে পারেন নি। এই গ্রন্থে কুকুভ, লুম, খাম্বাজ, গারা, ঝিঁঝিট, পাহাড়ী প্রভৃতি এমন কতকগুলি রাগের পরিচয় দেওয়া আছে যেগুলি উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশেষ প্রিয় ছিল, এখন আর বাংলায় তেমন শোনা যায় না। যে খাম্বাজ রাগে একদা বহু উত্তম বাংলা গান রচিত হয়েছে আজকাল সেই রাগটিই শোনা যায় কদাচিত। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ থেকে এইসব রাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য আহরণ করতে পারেন। দুঃখের বিষয় গ্রন্থটি আজকাল দুর্লভ হয়ে পড়েছে। আমাদের সঙ্গীতশিল্প সংরক্ষণ প্রয়াসে এটির পুনর্মুদ্রণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয়ের আর একটি উৎকৃষ্ট স্বরলিপি গ্রন্থ হচ্ছে "হারমোনিয়মে গান শিক্ষা"। এটিও দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে রচিত। এতে প্রাচীন কবি, গিরিশ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি অনেকের গানের সুর রক্ষিত হয়েছে। এইরকম আর একখানি গ্রন্থ "গীত-বাদ্য-সোপান" —এতে প্রদত্ত গানগুলির স্বরলিপি করেছেন দেবকণ্ঠ বাগচী মহাশয়। তিনি কৃষ্ণধনবাবুর রীতি অবলম্বন করেছেন। এই বইটিতেও অনেক পুরোনো নাট্যসঙ্গীত রয়েছে যেগুলি থেকে সেকালকার সরল অথচ সুন্দর রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত নাট্যসঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য কেননা কাব্যসঙ্গীতের বিকাশে সেকালের নাট্যসঙ্গীতের দান স্বল্প নয়। গিরিশ ঘোষের বহু গানে অনেক নতুন রীতি অবলম্বিত হয়েছে। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এসব গান হয়তো অনেকের রুচির সঙ্গে মিলবে না; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় কাব্যসঙ্গীতের বিবর্তনে এইসব নাটকের গানের মূল্য নেহাৎ কম নয়। নানাকারণে এইসব গানের স্বরলিপি রক্ষিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

নাট্যসঙ্গীতে শুধু লঘুসঙ্গীতই রচিত হয় নি, বহু উচ্চাঙ্গের গানও

রচিত হয়েছে। ধ্রুপদ ধামার থেকে আড়-খেমটা পর্যন্ত নানাধরনের গান আমাদের নাট্যসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। এইসব অনেক গানের স্বর-লিপি ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে সেগুলি একসঙ্গে সংগ্রহ করলে নাট্যসঙ্গীতে আমাদের কাব্যসঙ্গীতের কতখানি উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে সেটা বোঝা যাবে।

সেকালের "সঙ্গীতপ্রকাশিকা"য় নানাধরনের গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল। এইসব স্বরলিপি অনুসন্ধান করে দেখলে আমাদের অব্যবহিত পূর্বযুগের কাব্যসঙ্গীতের রূপ কি রকম ছিল সেটা বোঝা সহজ হবে।

সেকালের কাব্যসঙ্গীতের কতকগুলি উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় স্বরলিপি গীতিমালার তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত গানগুলিতে। "নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি" বা "কেনই বা ভুলিব তোমায় কে ভোলে হৃদয় ধনে"—এই ধরনের গানগুলিতে সেযুগের একটা বিশিষ্ট রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। গানগুলি ঠিক টপ্পা নয় অথচ টপ্পার রেশ রয়েছে—টপ্পার যুগের পরে কাব্যসঙ্গীতে যে সংস্কার সাধিত হয়েছিল, তারই প্রভাবে এইসব গান রচিত হয়েছে। সাংখ্য-মাত্রিক "শতগান" নামক স্বরলিপিগ্রন্থেও এই ধরনের কিছু গান আছে।

উল্লিখিত উদাহরণগুলি থেকে যেসব পুরোনো স্বরলিপির বই অনাদরে অবহেলায় দোকানে বা বহু ব্যক্তির কাছে পড়ে আছে সে-গুলির মূল্য কতখানি সেটি স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সব পুরোনো বই থেকে সাঙ্গীতিক মূল্যসম্পন্ন গানগুলি বেছে নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে, তারপরে সেইসব স্বরলিপিকে সরলতর অর্থাৎ আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে পরিবর্তিত করে টিকা-টিপ্পনী এবং ভূমিকা সহযোগে সুসম্পাদিত করতে হবে। এই কাজটি নেহাৎ সামান্যও নয় এবং সহজসাধ্যও নয়। নির্দেশটা এক লাইনে লিখে দেওয়া যেতে পারে ; কিন্তু বাংলা গান সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং ব্যাপক পরিচয়

না থাকলে একাজে হাত দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া সমস্ত পুরোনো স্বরলিপিব বই একত্র করাও তো কম অধ্যবসায়ের ব্যাপার নয়। বিশ্ব-ভারতী বর্তমানে কেবলমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপারে যেরকম ধারা অবলম্বন করেছেন, সমগ্র বাংলা গানের ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগ আরও পরিশ্রম করে করতে হবে নতুবা ফল খুব সন্তোষজনক হবার আশা কম। এই অতিশয় ব্যাপক কাজটি দুঃসাধ্য হলেও অন্তত নানা গ্রন্থ থেকে সংকলন করে এমন একটি স্বরলিপি-সংগ্রহ প্রকাশ করা দরকার যাতে আমাদের বাংলা গানের বিবর্তনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

এইরকম প্রচেষ্টার আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে—সেটি হচ্ছে সাধারণের মধ্যে আমাদের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যবোধ জাগ্রত করা। বাংলা গান যে ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত হয়েছে সেটা যেন আমাদের ধারণাতেই আসে না এবং এই কারণেই যিনি যেটুকু গান শিখেছেন তিনি মনে করছেন বাংলা গানে সেটুকুই বিশেষ সৃষ্টি তাঁর তুলনা আর অন্য কোন রচনায় মেলে না। এই অজ্ঞ শিক্ষার প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার আর তারই জন্য এইসব লুপ্ত স্বরলিপির পুনরুদ্ধার একান্ত প্রয়োজন।

এর মধ্যে আবার আরও এক কঠিন সমস্যা আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, স্বরলিপি উদ্ধার হলেও তার গায়কীটাও জানা দরকার। অনেক টপ্পা ধরনের গান আছে যার একটা কাঠামো করে দেওয়া আছে স্বরলিপিতে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্বরলিপি দেখে দেখে এগানগুলি তুললে তার কোন বৈশিষ্ট্যই থাকবে না। এই কারণে নানা গানের বিশেষ গায়ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়াও দরকার। পরিশ্রম করে আমাদের সেগুলিও জেনে নিতে হবে।

আর একটি মহদুদ্দেশ্য এতে সাধিত হবে—সেটি হচ্ছে স্বরলিপিব একটা Standardisation বা মান-নির্ধারণ। আকারমাত্রিক স্বর-লিপি তো সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেই ; কিন্তু বহু স্বল্প-অভিজ্ঞ স্বরলিপিকার

এই পদ্ধতিটি সমগ্রভাবে শিক্ষা করেন নি। ব্যাপকভাবে বিভিন্ন পদ্ধতির স্বরলিপিগুলি আকারমাত্রিকে পরিবর্তিত হতে থাকলে অনেকেই এই পদ্ধতির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হতে পারবেন এবং ক্রমেই আকারমাত্রিক স্বরলিপি নিখুঁত হয়ে উঠবে।

লোকসঙ্গীতের স্বরলিপির বই আমাদের দেশে নেই অথচ লোক-সঙ্গীতের সঙ্কলন গ্রন্থ অনেক আছে। স্বরলিপি করে লোকসঙ্গীতকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা অবশ্য সহজ ব্যাপার নয়, কিন্তু তথাপি তার কাঠামোটা অনায়াসেই রাখা যায়। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে যেমন আমরা মূল সুরটির স্বরলিপি করতে পারি তেমনি লোকসঙ্গীতকেও যেখানে সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করবার উপায় নেই সেখানে তার মূল সুরটি অনায়াসেই লিপিবদ্ধ করা যায়। একটু পরিশ্রম করলে অনেক গান সম্পূর্ণভাবেও স্বরলিপি কবে রাখা যায়। বাঙলাব প্রতি জেলায় শহরে গ্রামে অনেক গায়ক এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছড়িয়ে আছেন, তাঁরা দেশের সেবা হিসাবে বা নিজের সংগ্রহের জন্যও এই কাজটি করতে পারেন। বাঙলার বিভিন্ন স্থানে যেসব লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে, সেগুলির স্বরলিপি যদি আমরা একত্র সমাবেশ করতে পারি, তাহলে লোকসঙ্গীতেব ক্রমোন্মেষ এবং নানাদিক দিয়ে সর্বাঙ্গীন পরিচয় পাবার সুযোগ আমাদের হতে পাবে। এই কাজটি যদি করা যায়, তাহলে সঙ্গীতেব একটি বিরাট রূপ নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারব। এতে শুধু সঙ্গীতেরই নয় আমাদের দেশের ইতিহাসেরও কতকগুলো সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পাবে।

শেষ